আলকুরআনের আলোকে মানুষ ও মানুষের শেষ পরিণতি

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

আলকুরআনের আলোকে মানুষ
ও
মানুষের শেষ পরিনতি

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com

ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ। মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্যে অবতীর্ণ হেদায়াত অর্থাৎ জীবন বিধানের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক গ্রন্থরূপ। কোরআন মূলত জীবন বিধান গ্রন্থ হলেও শরীয়তের আহকাম অর্থাৎ আইন কানুন বর্ণণার মধ্যেই এর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং মহান আল্লাহতায়ালার সত্ত্বা ও গুণাবলী গোটা বিশ্বজাহান ও তার মধ্যে বিদ্যমান ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব, বিকাশ ও ক্ষয় কোরআনের আলোচ্যসূচীতে স্থানলাভ করেছে। তাছাড়া জ্ঞানের এমন কোন শাখা-প্রশাখা নেই যে বিষয়ে কোরআন কম-বেশী আলোকপাত করেনি। এক্ষেত্রে মানুষের সৃষ্টি ও বিকাশ যা আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 'জীববিজ্ঞান'। সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল আলোচনা আলকোরআনে স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে এমন অনেক তথ্য কোরআনে আলোচিত হয়েছে যা মানুষ হাজার বছর ধরে জ্ঞান গবেষণার পরও কোন সমাধানে উপনীত হতে পারেনি। অথচ ঐশীগ্রন্থ কোরআন সেসব সমস্যার অতি সুন্দর ও সহজ সমাধান পেশ করেছে যেমন-মানুষের রুহ বা আত্মা সমস্যার সমাধান। এছাড়া পৃথিবীর জীবনই যে মানব জীবনের চূড়ান্ত কথা নয় বরং এরপরও অন্য এক জীবন আছে বস্তুবাদীরা যাকে অস্বীকার করে সে সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালো এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোরআন উপস্থাপন করেছে। অতএব কোরআন মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধান সম্পর্কিত বর্ণনার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের সৃষ্টি রহস্য ও তার পরিণতিকেও উন্মোচিত করেছে।

কোরআনে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো তার নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে কোরআন যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য উপস্থাপন করেছে কোরআন অধ্যয়ন করে সে বিষয় জানা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান আলেম ও পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিগণও এ বিষয়ে উদাসীন, সাধারণ মানুষের বিষয়তো আরও হতাশাব্যঞ্জক। যারা কোরআন পড়েন তারা তা করেন নিছক পূন্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, আর যারা আলেম সমাজ তারা পড়েন শুধুমাত্র ধর্মীয় বিধিবিধান এবং আখেরাতের জীবন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য।

ইসলামের সোনালী যুগে মুসলমানদের উন্নতি ও প্রগতির প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল জ্ঞানের সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য আর যখন তাদের পতন হয় তখন তা ঘটে তাদের ভোগ ও বিলাসিতার কারণে। আবার আজকে যখন মুসলমানরা মার খাচ্ছে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তা ঘটছে শুধুমাত্র অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবে। তাই মহাগ্রন্থ আলকোরআনের নির্দেশ 'পড়' এই আহকামটি পালনে মুসলমানদের নারী পুরুষ সকলকে জাগ্রত করা, অনুপ্রাণিত করাই আমার কোরআন কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র এ প্রয়াস ও প্রচেষ্টার লক্ষ্য। আল্লাহর নিকট একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন।

পুস্তিকাটি প্রকাশে ভাই আমানতুল্লাহ, সাইফুল্লাহ ও জাহাঙ্গীর কবির সহ যেসব সুহৃদ নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আল্লাহর দরবারে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করছি।

তারিখ :
জুন ২০০৯ ইসায়ী

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
মধ্যপাড়া মসজিদ রোড
বয়রা, খুলনা।

www.pathagar.com

সুচীপত্র

- ❑ আদম (আঃ) এর সৃষ্টি ও খিলাফাত ৭
  - ○ মানুষ পরিকল্পিত সৃষ্টি ১৩
  - ○ মানুষ সৃষ্টির দুই ভিন্ন উপাদান ১৪
  - ○ মানুষ ও খিলাফাত ১৭
  - ○ মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ২১
  - ○ মানুষ, ইবলিস ও ফেরেস্তা ২৩
  - ○ মা হাওয়ার সৃষ্টি ২৬
  - ○ আদম (আঃ) এর জান্নাতে অবস্থান ও মানুষের পরীক্ষা ২৭
  - ○ মানুষের লজ্জাশীলতা ৩১
  - ○ মানুষের সাথে লড়াইয়ে শয়তানের হাতিয়ার ৩২
  - ○ নিষিদ্ধ গাছের ফল কে আগে খেয়েছে-আদম না হাওয়া ? ৩৬
  - ○ গুনাহ ও তওবা ৩৮
- ❑ মানব বংশ বিস্তার ৩৯
- ❑ মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর ৪৪
- ❑ মানুষের দৈহিক গঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ৫০
- ❑ পৃথিবীতে মানুষের জীবন জীবিকার ব্যবস্থাপনা ৬০
- ❑ মানুষের শেষ পরিনতি ৬৬
- ❑ মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা ৭৫

www.pathagar.com

আদম (আঃ) এর সৃষ্টি ও খিলাফাত

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দান করেছেন। জগতে বিদ্যমান কোটি কোটি মানুষ ও তাদের পূর্ব পুরুষ সবাই আদমের (আঃ) সন্তান। তিনিই হলেন জগতের প্রথম মানুষ। আর তাই শিকড় সন্ধানী প্রতিটি মানুষ জানতে চায় আদম (আঃ) এর সৃষ্টি রহস্য এবং পৃথিবীতে তাঁর আগমনের ইতিকথা। এখানে আদম (আঃ) এর সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে আলকোরআনের বাণী তুলে ধরা হলো ঃ

(১) "আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই। ফেরশতারা বললো আপনি কি এমন কাউকে আপনার প্রতিনিধি বানাতে চান যারা আপনার জমিনে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করে বেড়াবে। আপনার তসবীহ পড়া ও পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্যে তো আমরাই আছি। আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ আমি যা জানি তা তোমরা জানোনা। আল্লাহ তায়ালা অতঃপর (তার প্রতিনিধি) আদমকে সব ধরণের জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। পরে তিনি তা ফেরেশতাদের কাছেও পেশ করে বললেন ঃ (আমার প্রতিনিধি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে দেখি) তোমরা এ নামগুলো বলতো? ফেরশতারা বললো একমাত্র আপনিই (সকল দোষ ত্রুটিমুক্ত এবং) পবিত্র, আমরাতো শুধু সেইটুকু জানি যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সব কিছুর জ্ঞানতো একমাত্র আপনারই জানা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এবার আদমকে বললেন, সেসব জিনিসের নাম ফেরেশতাদের বলে দিতে। আদম (আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক) ফেরেশতাদের নামগুলো বলে দিলেন। এবার আল্লাহ ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান জমিনের যাবতীয় গোপন রহস্য জানি। তোমাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্য আমি ভালো ভাবেই অবগত আছি। অতঃপর আল্লাহ পাক যখন ফেরশতাদের বললেন, তোমরা আদমকে সিজদা করো, ফেরেশতারা (একবাক্যে আল্লাহর আদেশ মেনে নিয়ে) আদমকে সিজদা করলো, শুধুমাত্র ইবলিস আদমের সামনে সিজদা করলোনা। সে তার অহংকারের বড়াই করলো এবং পরিনামে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানদের তালিকায় নিজেকে শামিল করে নিলো। এবার আমি আদমকে লক্ষ্য করে বললাম ঃ তুমি এবং তোমার স্ত্রী পরম সুখে এই জান্নাতে বসবাস করতে থাকো। (জান্নাতের) এই ভান্ডার থেকে যা তোমাদের মন চায় তাই তোমরা স্বাচ্ছন্দের সাথে ভোগ করতে পারো, তবে কোন অবস্থায়ই ঐ গাছটির কাছেও যেওনা। অন্যথায় তোমরা দুজনই সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান শেষ পর্যন্ত তাদের উভয়কেই প্ররোচিত করলো। তারা উভয়ই জান্নাতের (পরমসুখে) যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বের করেই ছাড়লো। আমি তাদেরকে

www.pathagar.com

বললাম, তোমরা এখান থেকে নেমে পড়ো, এবার তোমাদের গন্তব্যস্থল হবে পৃথিবী। সেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা জীবন যাপন করবে। তবে মনে রেখো, তোমরা এবং শয়তান (চিরদিনের জন্য) একে অন্যের দুশমন। অতঃপর আদম আল্লাহর কাছ থেকে কিছু বাণী পেলো, আল্লাহ তায়ালা তার তওবা গ্রহণ করে তাকে মাফ করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বড়ই মেহেরবান ও ক্ষমাশীল।

আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা সবাই এবার এখান থেকে নেমে যাও। (নতুন গন্তব্যস্থলে গিয়েও মনে রেখো তোমরা কিন্তু একেবারেই স্বাধীন নও)। সেখানে অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত) হেদায়াত আসবে। যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে তাদের কোন ভয়, উৎকণ্ঠাও চিন্তার কারণ থাকবেনা। আর যারা আমার বিধানকে অস্বীকার করবে এবং এ বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (লাগামহীন জীবন যাপন করবে) তারা অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। সে বাসস্থান হবে চিরন্তন।" (আল বাকারা ঃ ৩০-৩৯)

(২) "সৃষ্টির শুরুতে তোমাদের আমিইতো মাটি থেকে তৈরী করেছি, সেই মাটির দেহে আমিই তোমাদের বিভিন্ন আকার অবয়ব দান করেছি, অতপর আমি ফেরেশতাদের আদেশ করেছি যে, আদমকে সেজদা করো, আমার আদেশে সবাই আদমকে সেজদা করলো- একমাত্র ইবলীস ছাড়া। সে কিছুতেই সেজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলোনা। আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যখন নিজেই তোমাকে সেজদা করার আদেশ দিলাম, তখন কোন জিনিস তোমাকে সেজদা করা থেকে বিরত রাখলো। ইবলীস বললো, (আমি কিভাবে তাকে সেজদা করি) আমিতো তার চাইতে উত্তম। কারণ তুমি আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে। আল্লাহ তায়ালা বললেন- তুমি এখন এ পবিত্র জায়গা থেকে নেমে যাও। এখানে আমার সামনে বসে অহংকার করবে - এটা তোমার পক্ষে কখনো সাজেনা - যাও এখান থেকে বেরিয়ে যাও। লাঞ্ছনা যাদের ভাগ্য-দশা তুমি সেই অপমানিতদের একজন। সে বললো তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত বাঁচার অবকাশ দাও, যেদিন এ আদম সন্তানদের পুনরায় কবর থেকে উঠানো হবে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, (হ্যা, যাও) যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমিও তাদের একজন। সে বললো, যেহেতু তুমি এই আদমের জন্যেই আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলে আমি অবশ্যই এদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তোমার সহজ ও সরল পথের বাঁকে ওৎ পেতে বসে থাকবো। অতপর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে আমি তাদের কাছে অবশ্যই আসবো, তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পিছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাম দিক থেকে। সর্বদিক থেকেই তাদেরকে এমনভাবে গোমরাহ করার চেষ্টা করবো যে, তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই তোমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ দেখতে পাবে না। আল্লাহ তায়ালা বললেন বের হয়ে যাও এখান থেকে, অপমানিত ও বিতাড়িত

www.pathagar.com

অবস্থায়। তুমিও জেনে রাখো আদম সন্তানের যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের এবং তোমাদের সবাইকে দিয়ে নিশ্চয়ই একদিন আমি জাহান্নাম পূর্ণ করে দেবো। আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেলেন, তুমিও তোমার সংগিনী এখন থেকে জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং এর যেখানে যা কিছু তোমরা চাও, তা তোমরা খেতে পারো- কিন্তু এই গাছটির কাছেও যেওনা। নতুবা তোমরা উভয়েই জালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। অতপর শয়তান তাদের দুজনকেই কুমন্ত্রণা দিলো যেন তারা একে অপরের কাছে নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহ যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিলো- প্রকাশ করে দেয়, সে আরো তাদের বললো, তোমরা কি জানো তোমাদের মালিক তোমাদের এই গাছটির কাছে যাওয়া থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এখানে গেলে তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এর ফলে তোমরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সে তাদের কাছে আস্থাভাজন হওয়ার জন্যে কসম করে বললো, দেখো আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্যে তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন। এভাবেই শেষ পর্যন্ত সে এদের দুজনকেই ধোকার জালে আটকে ফেললো। অতপর একসময় যখন তারা উভয়েই সে গাছ ও তার ফল আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান সমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো। সাথে সাথে তারা জান্নাতের বিভিন্ন গাছপালার পাতা নিজেদের ওপর জড়িয়ে নিজেদের গোপন স্থান সমূহ ঢাকতে শুরু করলো। এই পদসখলন দেখে তাদের মালিক তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এই গাছটির কাছে যাওয়া থেকে নিষেধ করিনি? আর আমি কি তোমাদের একথা বলে দেইনি যে, শয়তান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের দুশমন? নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা দুজনেই বলে উঠলো হে আমাদের প্রভু- আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের মাফ না করো, তাহলে আমরা অবশ্যই চরম ক্ষতিগ্রস্থদের দলে শামিল হয়ে যাবো। আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাদের লক্ষ্য করে বললেন, (হাঁ আমি মাফ করে দিলাম তবে এবার তোমরা সবাই) এস্থান থেকে চলে যাও। মনে রেখো আজ থেকে তোমরা ও শয়তান চিরদিনের জন্যে একে অপরের দুশমন। এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জমিনে থাকার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জায়গা ও জীবন সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলো। আল্লাহ আরো বললেন সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সবকিছুর শেষে একদিন সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।" (আরাফ ঃ ১০-১৫)

(৩) "অবশ্যই আমি মানুষকে বানিয়েছি ছাঁচে ঢালা মাটির শুকনো মন্ড থেকে এবং তারও আগে আমি জ্বিনদের সৃষ্টি করেছি আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে। সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, অচিরেই ছাঁচে ঢালা মাটির শুকনো মন্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি সুঠাম করে নেবো এবং আমার রূহ

www.pathagar.com

থেকে কিছু ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সেজদাবনত হয়ে যাবে। অতপর আল্লাহর আদেশে ফেরেশতারা সবাই সেজদা করে নিলো। একমাত্র ইবলিস ছাড়া- সে সেজদাকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করলো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমার কি হলো, তুমি যে সেজদাকারীদের দলে শামিল হলে না। সে বললো (হে আল্লাহ) এটা আমার জন্য শোভনীয় কাজ নয়, যে এমন এক মানুষকে সেজদা করবো যাকে তুমি আমাদেরই সামনেই ছাঁচে ঢালা মাটির শুকনো কিছু মন্ড থেকে তৈরী করেছো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, এই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে তুমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। কেননা আজ থেকে তুমি এক অভিশপ্ত শয়তান এবং হিসাব নিকাশের দিন কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ওপর আমার এই অভিশাপ রইলো। সে বললো হে আমার মালিক তবে তুমিও আমাকে সেদিন পর্যন্ত বাঁচার এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার অবকাশ দাও- যেদিন সব মানুষ পুনরায় তোমার সামনে হাজির হবে। আল্লাহ তায়ালা বললেন হাঁ যাও, যাদের এ অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমিও তাদের দলভুক্ত হলে। সেই সুনির্দিষ্ট সময়টি আসার দিন পর্যন্ত। সে বললো হে আমার মালিক, তুমি যেভাবে আজ আমার সর্বনাশ করে দিলে, আমিও তোমার শপথ করে বলছি আমি দুনিয়ার মানুষদের জন্যে গুনাহর কাজ সমূহকে শোভন করে তুলবো এবং তাদের সবার আমি সর্বনাশ করে ছাড়বো, তবে তোমার যারা একনিষ্ঠ বান্দা তাদের কথা আলাদা, (তারা আমার কথায় বিভ্রান্ত হবে না)। আল্লাহ তায়ালা বললেন (পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাঝ দিয়ে চলার) এটাই হচ্ছে আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছানোর সহজ সরল পথ। আর এ গোমরাহ মানুষদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার যারা খাঁটি বান্দা তাদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য চলবে না। আর জেনে রেখো, তোমার অনুসারীদের সবার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন আজাবের প্রতিশ্রুতি। তাতে থাকবে সাতটি বিশালাকার দরজা, আবার তার প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন দল। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তারা সবাই সেদিন থাকবে জান্নাত ও ঝর্ণাধারায় বহুমুখী নেয়ামতে। জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তাদের এই বলে অভিবাদন জানানো হবে যে, তোমরা শান্তি ও নিশ্চয়তার সাথে সেখানে প্রবেশ করো। তাদের পারস্পারিক ঈর্ষা বিদ্বেষ যাই থাক না কেন, আমি তা তাদের মন থেকে দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থায় সেখানে অবস্থান করবে। সেখানে তাদের কোনোরকম অবসাদ পর্যন্ত স্পর্শ করবে না, তারা সেখান থেকে কোনোদিন বহিস্কৃতও হবেনা।" (আল হেজর ঃ ২৬-৪৮)

(৪) "(সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন বারবার সতর্ক করা সত্বেও আদম দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকতে পারেনি) আমি ফেরেশতাদের যে সময় বললাম, তোমরা আদমকে সেজদা করো তখন তারা সাথে সাথেই তার প্রতি সেজদা করলো, কিন্তু ইবলিস সেজদা করোল না, সেজদা করাটাকে সে অস্বীকার করলো। তখন আমি আদমকে বললাম, এই অভিশপ্ত শয়তান

www.pathagar.com

হচ্ছে তোমার ও তোমার জীবন সাথীর দুশমন। সুতরাং দেখো এমন যেন না হয় যে, সে এক সময় তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে দেবে এবং এর ফলে তোমরা দারুন দুঃখকষ্টে পড়ে যাবে। এই জান্নাতে তো তোমার সব রকম আরামের ব্যবস্থা রয়েছে যেমন, এখানে তুমি কখনও ক্ষুধার্ত হওনা- কখনো পোশাক বিহীনও হওনা। তুমি কখনো এখানে পিপাসার্ত হওনা- কখনো রোদেও কষ্ট পাওনা। কিন্তু এতো সাবধান করা সত্বেও শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, সে বন্ধুর বেশে এসে বললো, হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবন দায়িনী একটি গাছের কথা বলবো যার ফল খেলে তুমি চিরঞ্জীব হবে এবং বলবো এমন রাজত্বের কথা- যার কখনো পতন হবেনা। অতপর তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলো, সাথে সাথেই তাদের শরীরের লজ্জাস্থান সমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো, তারা লজ্জায় তাড়াতাড়ি করে জান্নাতের বিভিন্ন গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলো। এভাবেই আদম তার মালিকের নাফরমানী করলো এবং একারণেই সে সাময়িকভাবে পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু তার ক্ষমা প্রার্থনার পর তার মালিক তাকে (নবুওতের জন্য) বাছাই করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে সঠিক পথ নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন (শয়তান ও তোমরা এখন) উভয় দলই এখান থেকে নেমে পড়ো তবে মনে রাখবে তোমরা কিন্তু একজন আরেকজনের জঘন্য দুশমন, (এখন থেকে তোমাদের আরেক জীবন শুরু হলো, আর সে জীবন পরিচালনার জন্যে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত এলে তখন যে কেউই সে হেদায়াতের অনুসরণ করবে সে না কখনো দুনিয়ায় বিপথগামী হবে, না আখেরাতে সে কোন কষ্ট পাবে। তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াতের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে জীবনের বাঁচার সামগ্রী সংকুচিত হয়ে যাবে, সর্বোপরি তাকে আমি কেয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাজির করবো।" (ত্বাহা ঃ ১১৬-১২৪)

(৫) "স্মরণ করো যখন তোমার মালিক ফেরশতাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি মাটি থেকেই অচিরেই মানুষ তৈরী করতে যাচ্ছি। তাদের আমি আরো বলেছি, যখন তাকে সম্পূর্ণ বানিয়ে সুঠাম করে নেবো এবং ওতে আমার পক্ষ থেকে রূহ তথা জীবনের সঞ্চার করবো যখন তোমরা আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে তার প্রতি সেজদাবনত হয়ো। অতপর যখন সে কাঠামোকে আমি মানুষে পরিনত করলাম তখন ফেরেশতারা সবাই একে একে সেজদা করলো একমাত্র ইবলিস ছাড়া। সে অহংকার করলো এবং সে সেজদা করতে অস্বীকার করে কাফেরদের অনুর্ভূক্ত হয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইবলিস, তোমাকে কোন জিনিসটি তাকে সেজদা করা থেকে বিরত রাখলো- যাকে আমি স্বয়ং নিজের হাত দিয়ে পয়দা করেছি। তুমি কি উদ্ধত্য প্রকাশ করেই এ থেকে বিরত থাকলে, না তুমি কোন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কেউ যে, তুমি নিজেকে এ আদেশের আওতাভুক্ত মনে করলে না? সে বললো, হাঁ আমি তো তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাকে মাটি থেকে বানিয়েছো আর আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে।

www.pathagar.com

অতএব আগুন কি মাটি থেকে শ্রেষ্ঠ না? আল্লাহ তায়ালা বলেন, এই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে তুমি সেখান থেকে বের হয়ে যাও। কেননা তুমি হচ্ছো অভিশপ্ত, আর অভিশপ্ত কারো স্থান আমার এখানে নেই এবং তোমার উপর আমার অভিশাপ বলবত থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। সে বললো, হ্যাঁ আমি বেরিয়ে যাচ্ছি তবে হে আমার মালিক, তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অবকাশ দাও -যেদিন সব মানুষদের দ্বিতীয়বার জীবিত করে তোলা হবে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হ্যাঁ যাও যাদের সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে, তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত হলে। অবধারিত সময়টি আসার সে নির্দিষ্ট দিনটি পর্যন্ত তুমি তোমার কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে পারবে। সে বললো হ্যাঁ আমি তোমার ক্ষমতার কসম করে বলছি, আমি তাদের সবাইকেই বিপদগামী করে ছাড়বো তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ট বান্দা তাদের ছাড়া। কেননা তারা কোনদিনই আমার কথায় তোমার নাফরমানী করে না। আল্লাহ তায়ালা বললেন এই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, আর আমি এই সত্য কথাটাই বলছি যে, তোমার ও তোমার অনুসারীদের দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই।" (ছোয়াদঃ ৭১-৮৫)

(৬) "স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি ফেরশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সেজদা করো, তারা সবাই আমার আদেশে সেজদা করলো, কিন্তু ইবলিস ছাড়া। সে বললো, আমি কিভাবে তাকে সেজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো। সে বললো (হে আল্লাহ) তুমি কিভাবো যে, যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করলে- যদি তুমি একবার আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার অবকাশ দাও তাহলে আমি অবশ্যই তার বংশধরদের নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসবো, তবে একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া যারা আমার কাছ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, যাও- দূর হয়ে যাও এখান থেকে। তাদের মধ্যে যারা তোমার আনুগত্য করবে তোমাদের সবার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, আর জাহান্নামের শাস্তিও পুরাপুরি। এদের মধ্যে যাকেই পারো তুমি তোমার আহবান দিয়ে গোমরাহ করে দাও, তোমার যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে তাদের ওপর চড়াও হও, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে তুমি সাথী হয়ে যাও এবং যতো পারো তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো, আর জানা কথা যে শয়তানতো মানুষদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে। নিসন্দেহে আমার খাস বান্দাহ তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবেনা। হে নবী তোমার মালিক আল্লাহ তায়ালাই তাদের কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট।" (বনি ইসরাইল ঃ ৬১-৬৫)

(৭) "সে সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন আমি ফেরশতাদের বলেছিলাম, তোমরা সবাই আদমকে সেজদা করো, তখন তারা সবাই আল্লাহর হুকুমে আদমকে আগাম সেবার নিদর্শন হিসেবে সেজদা করলো- কিন্তু ইবলিস সেজদা করলোনা। মূলত সে ছিলো জ্বিনদেরই একজন। সে তার

www.pathagar.com

মালিকের আদেশের নাফরমানী করলো। যে আমার সাথে এতোবড়ো নাফরমানী করলো তোমরা কি তাকে এবং তার সাংগো-পাংগো ও বংশধরদের আমার বদলে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করছো? অথচ প্রথম দিন থেকেই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। তোমরা এও দেখতে পেয়েছো যে, যালেমদের কি নিকৃষ্ট বিনিময় দেয়া হয়েছে।" (আল-কাহফ ঃ ৫০)

মহাগ্রন্থ কোরআনের উপরোক্ত সাত জায়গায় আদম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মানব সৃষ্টি, মানুষের মর্যাদা ও পৃথিবীতে মানুষের আগমন সম্পর্কিত বহু অজানা বিষয় জানানো হয়েছে। পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে উদ্ধৃতিগুলির আলোকে সেসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

(ক) মানুষ পরিকল্পিত সৃষ্টি

মানুষ বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম সৃষ্টি। জগতের শ্রেষ্ঠ disigner আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সর্বাগ্রে মানুষের কাঠামো তৈরী করেন। মানুষের জন্যে তিনি এমন কাঠামো বাছাই করেন যার চেয়ে সুন্দর ও উত্তম কাঠামো অন্য কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। এ প্রসংগে মহাগ্রন্থ আলকোরআনে আল্লাহর বাণী ঃ

"অবশ্যই আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি এর সর্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দরতম আকৃতিতে।" (আত্তীন ঃ ৪)

পাঠক, আপনি আপনার নিজের দেহ কাঠামোকে ভালভাবে দেখুন, আপনার পরিবারের নারী-পুরুষ অন্যান্য সদস্যদের দিকে অনুসন্ধিৎস্যু দৃষ্টি দিয়ে তাকান। আপনার চারপাশে বিচরণরত গরু-ছাগল ও কুকুর-বিড়ালসহ অন্যান্য জীব জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করুণ। কি দেখছেন? মানুষের কাঠামোর সংগে তাদের কোনো সাদৃশ্য পাচ্ছেন কি- পাচ্ছেন না। সত্যিই মানুষের কাঠামোই সুন্দরতম। আরো লক্ষ্য করুণ, এসব জন্তু মাথা উঁচু করে চলতে পারেনা। মানুষই একমাত্র প্রাণী সে দুপায়ে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে হাটতে পারে। মানুষের কাঠামোগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে, যা অন্য প্রাণীর পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়না। মহান আল্লাহ তাঁর এই সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষকে এক মহা পরিকল্পনার আওতায় সৃষ্টি করেছেন এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অতএব মানুষ উদ্দেশ্যহীন কোনো অপরিকল্পিত সৃষ্টি নয়। কোরআনের উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করলে আমরা এ সত্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো। সুরা আল বাকারার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মহা সমাবেশে ঘোষণা করেন, ' আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই'। সুরা আরাফে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমিইতো মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, সেই মাটির দেহে আমিই তোমাদের বিভিন্ন আকার অবয়ব দান করেছি'। সুরা

www.pathagar.com

আল হিজর-এ আল্লাহ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, অচিরেই ছাঁচে ঢালা মাটির শুকনো মন্ড থেকে আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি সুঠাম করে নেবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সেজদাবনত হয়ে যাবে। অতপর আল্লাহর আদেশে ফেরেশতারা সবাই সেজদা করে নিলো'। সুরা ছোয়াদের উদ্বৃত আয়াত সমূহের শুরুতেই ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ অনুরূপ ঘোষণা দেন।

অতএব, নিসন্দেহে আমরা মানুষরা সোচ্চার কণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে এ ঘোষণা দিতে পারি যে, আমরা ডারউইনবাদের বানর বা শিমপাজীর বংশধর নই। আমরা বস্তুর বিবর্তিত কোন সংস্করণ নই। আমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। আমরা আদিতে মানুষ ছিলাম, এখনও আমরা মানুষ এবং ভবিষ্যতেও মানুষই থাকবো।

আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী আল্লাহ তায়ালা অপরূপ সাজে মানুষের জন্য সজ্জিত করেছেন। কোরআনের ভাষায় তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন। গাছ-পালা-তরুলতা, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত যেখানে যা প্রয়োজন সবই স্থাপন করেছেন মহান আল্লাহ আমাদের পৃথিবী নামক উপগ্রহে। আর পৃথিবীর সকল সৃষ্টি মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আলকোরআনে আল্লাহর বাণী ঃ

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।" (বাকারাঃ ২৯)

অতএব, যে মানুষের জন্যে মহান স্রষ্টার পক্ষ হতে জগতের এত আয়োজন সে কি অপরিকল্পিত কিংবা উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি হতে পারে? মানব বিবেক তা মানতে রাজী নয়। যারা ডারউইনবাদের সমর্থক তারা পশুস্তরের সৃষ্টি বৈ অন্য কিছুই নয়।

(খ) মানুষ সৃষ্টির দুই ভিন্ন উপাদান

আমরা সুরা আল হিজর ও সুরা ছোয়াদ-এর আয়াতগুলি তেলায়াতে জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুই ভিন্ন উপাদান ঃ মাটি ও রূহ এর সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুরা হিজরে আল্লাহ বলেন ঃ " আমি পচা মৃত্তিকার গাড়া হতে একটি মানুষ তৈরী করছি। আমি যখন সেটাকে পুরা মাত্রায় বানিয়ে ফেলবো এবং তাতে নিজের রূহ হতে কিছু ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যাবে।" তিনি সুরা ছোয়াদে ঘোষণা করেন, "আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ তৈরী করবো। পরে আমি যখন তাকে পুরোমাত্রায় বানিয়ে দেবো এবং তাতে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার সম্মানে সেজদায় পড়ে যাবে।"

www.pathagar.com

যে মাটি দিয়ে মানুষের দেহ কাঠামো তৈরী করা হয়েছে এখানে তাকে পচা মাটির গাড়া অর্থাৎ মাটির সংগে পানি মিশালে মাটির যে অবস্থা দাঁড়ায় সে ধরণের মাটি হতে। কোরআনের অন্যত্র এ মাটিকে আঁশযুক্ত মাটি -এটেল মাটি অথবা আঠালো মাটি যা পচে গন্ধ হয়ে গেছে অথবা সেই পচা আঠা যা শুকাবার পর পাকানো মাটির ঠিকরা- ঢিলের মত হয়ে যায়। এমন মাটি যে মাটিতে মাটিজাত সকল উপাদান বিদ্যমান। এহেন মাটির কাঠামোতে আল্লাহ তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিলেন। ফলে সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম (আঃ) জীবন লাভ করলেন। জগত সভায় মানুষের পদযাত্রা শুরু হলো।

আমরা দেখতে পাই যে, মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এদিক থেকে অন্যান্য জীব জন্তুর সংগে মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলির বহুক্ষেত্রে মিল রয়েছে। মানুষ অন্যান্য পশুর ন্যায় ক্ষুধা লাগলে আহার করে। পরিশ্রান্ত হলে বিশ্রাম করে, যৌন চাহিদা পূরণে অগ্রবর্তী হয়, রোগ-শোকে কাতর হয়। এদিকগুলির বিবেচনায় মানুষও এক ধরণের পশু মাত্র। কিন্তু মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সবচেয়ে শক্তিমান ও বুদ্ধিমান পশুর থেকেও বহু বহু উর্ধ্বে। আর তার এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো মানব সৃষ্টির দ্বিতীয় উপাদান রূহ। আল্লাহ তায়ালা এ রূহকে আমার রূহ বলে নিজ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর তা এজন্যে করেছেন যেন সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কেননা, মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশেই সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহর বাণী ঃ

" তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন ঃ রূহ আমার পালন কর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" (বনি ইসরাইল ঃ ৮৫)

ইবলিস মাটির তৈরী মানুষকে দেখেছে, কিন্তু মানুষের মানুষ হওয়ার উপাদান আল্লাহর রূহ হতে সৃষ্ট আত্মা দেখতে পায়নি। তাই সে অহংকার বশত আদমকে (আঃ) সেজদা করতে অস্বীকার করেছে। মানুষের মাঝে যারা নাস্তিক তারাও শয়তানেরই পথ অনুসরণ করছে। অথচ আত্মাকে অস্বীকার করা মানুষের নিজের অস্তিত্ব অস্বীকারেরই নামান্তর।

মানব সত্বায় আত্মার ভূমিকাই মুখ্য। এই আত্মা তাকে আল্লাহর নিকটতম ফেরশতাদের নিকটবর্তী করে, তাকে আল্লাহর সাথে মিলিত হবার যোগ্য বানায়। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভের উপযুক্ত করে এবং নিছক বস্তুনির্ভর ও দৈহিক জৈবিক বিষয় সমূহের মধ্যে আটকে না থেকে সে যাতে মন ও আত্মার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো নিয়েও তৎপর হতে পারে, তার ক্ষমতা দান করে। এই আত্মা তাকে এমন গুপ্ত রহস্যের অধিকারী করে যা তাকে সময় ও কালের উর্ধ্বে অবস্থান করার সামর্থ যোগায় এবং তাকে দৈহিক শক্তির সীমার বাইরে এমন ধ্যান ধারণা ও চেতনা দান করে, যা তাকে মাঝে মাঝে পার্থিব ও জাগতিক সীমানার বাইরে নিয়ে যায়।

মাটি ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট মানুষের মধ্যে দুই ভিন্ন ও বিপরীতমুখী প্রকৃতি সক্রিয়। মানুষের জৈবিক সত্বা যা নিকৃষ্ট মাটির তৈরী মানুষকে যাবতীয়

www.pathagar.com

নীচতা, হীনতা ও সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে এবং তার আধ্যাত্মিক সত্তা যা আল্লাহর রূহ হতে প্রাপ্ত তা মানুষকে মনুষত্বের পথে উন্নতি ও মর্যাদার দিকে এবং খোদা প্রাপ্তির দিকে চালিত করে। মানুষের মাঝে ক্রিয়াশীল ইচ্ছা-অভিলাষ কিংবা কামনা-বাসনা তার জৈবিক সত্তার অর্থাৎ অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের মতই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আর এ কারণে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, যৌন সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি মানুষকে বস্তুজগতের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। কিন্তু মানুষের মাঝে আরও কতিপয় ঝোঁক-প্রবনতা ও আকুতি লক্ষ্যনীয় যেগুলো বস্তুতান্ত্রিক নয় এবং পার্থিব কোন মানদন্ডে যেগুলোকে বিচার করা যায়না। যেমন, জ্ঞান ও শিক্ষা, নৈতিকতা, ইবাদাত, আত্মসচেতনতা ইত্যাদি সবই অবস্তুতান্ত্রিক এবং এসবই মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার অস্তিত্বশীলতার প্রতি ইংগিতবহ।

মানব সত্তায় বিদ্যমান দুই ভিন্ন ও বিপরিতধর্মী উপাদান যে সত্যের নির্দেশ করছে তা হলো, মানুষ পশুও নয় এবং ফেরশতাও নয়। আল্লাহ তায়ালার এটা কাম্য নয় যে, মানুষ এই দুটির একটি থেকে বঞ্চিত হয়ে পুরোপুরি ফেরেশতা হয়ে যাক। মানুষের ক্ষেত্রে মাটি এবং রূহ এই উভয় উপাদানজনিত গুনবৈশিষ্টের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানই তার জন্যে নির্ধারিত ও কাংক্ষিত শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ স্তর। এদুটোর কোন একটিকে পুরোপুরিভাবে অর্জন করা মনুষ্যত্বের উর্ধ্ব মার্গে উন্নীত হওয়ার সমার্থক নয়। একারণেই পূর্ণ ভারসাম্যকে ব্যাহত করে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব মানুষের জন্য ও তার মৌলিক গুন বৈশিষ্ট্যের জন্যে ত্রুটি বিশেষ। তাছাড়া যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ ভারসাম্যহীনতায় সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনও ব্যাহত হয়।

এ প্রসঙ্গে জানা থাকা দরকার, যে ব্যক্তি তার দৈহিক জৈবিক শক্তিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, সে আধ্যাত্মিক শক্তিগুলোকে যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় করে রাখে তার সমকক্ষ। উভয়েই নিজ নিজ জন্মগত প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তার জন্য যা কামনা করেননি, তারা উভয়ে সেটাই কামনা করে। এক্ষেত্রে উভয়ে তার সৃষ্টিগত সত্তার একাংশকে ধ্বংস করার কারণে আত্মঘাতী হবার অপরাধে অপরাধী এবং এই আত্মঘাতী ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য।

উম্মুল মুমেনিন হযরত আশেয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস হতে আমরা জানতে পারি যে, যে ব্যক্তি বৈরাগ্য অবলম্বন করতে চেয়ে আর কখনো স্ত্রীলোকের ধারে কাছেও যাবেনা বলে সংকল্প প্রকাশ করেছিল, যে ব্যক্তি একদিনও পানাহার না করে এক নাগাড়ে রোজা রাখতে চেয়েছিল এবং যে ব্যক্তি একটুও না ঘুমিয়ে সারারাত জেগে নামাজ পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, প্রিয় নবী (সাঃ) তাদেরকে ধিককার দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত উক্ত হাদীসে যে ব্যক্তি আমার নীতি পছন্দ করেনা সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়- এই উক্তিটি উদ্বৃত্ত হয়েছে।

মানুষকে এই উভয় প্রকার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে এই স্বভাবের ভিত্তিতেই ইসলাম মানুষের জন্য শরীয়তের এমন বিধান রচনা করেছে যেন

www.pathagar.com

তার বহুমুখী যোগ্যতা ক্ষমতার মধ্যেকার কোন একটি যোগ্যতা ক্ষমতাও ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় না হয়। এ বিধানের একমাত্র বৈশিষ্ট হলো, মানুষের সবকটা যোগ্যতা-ক্ষমতার মাঝে ভারসাম্য কায়েম করা, যেন প্রতিটা যোগ্যতা-ক্ষমতা কোন প্রকার সীমা লংঘন কিংবা দুর্বলতা ছাড়াই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে এবং একটি অন্যটির উপর আগ্রাসন না চালায়।

(গ) মানুষ ও খিলাফাত

সুরা আল বাকারার আদম কাহিনী যেভাবে শুরু হয়েছে তা হলো, 'যখন তোমার প্রভু ফেরশতাদেরকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) পাঠাতে মনস্থ করেছি। ফেরেশতারা বললো ঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে যাচ্ছেন যে সেখানে অনাচার ও অরাজকতা বিস্তার করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা তো আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষনায় ব্যাপৃত আছি।' কোরআনের এ বাণী পৃথিবীতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টি জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ঘোষণা করছে। আর সে মর্যাদা হলো খিলাফাতের মর্যাদা অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি।

এ পর্যায়ে প্রত্যেক মানুষের মনে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হতে পারে, আর তাহলোঃ খিলাফাত কি? মানুষ কোন অর্থে আল্লাহর খালিফা? প্রকৃত পক্ষে খিলাফাত হলো একটি দায়িত্ব এবং এটি একটি মর্যাদাও। মর্যাদার প্রশ্নে মানুষ ফেরেস্তার উর্দ্ধে। আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পর পর ফেরেশতাদের দ্বারা তাকে সেজদা করানোর মাধ্যমে এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঠক একটি কথা জানা থাকা দরকার আর তাহলো ঃ মর্যাদা ও দায়িত্ব অবিচ্ছিন্ন। একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করার অর্থ হলো দেহ হতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার অনুরূপ।

এখন দেখা যাক এ দায়িত্বটি কি ছিল? এটি হলো মহান আল্লাহ তায়ালর জ্ঞান, শক্তি, নির্বাচনী ক্ষমতা, ইচ্ছা ও শাসন প্রভৃতি গুন-বৈশিষ্ট্যের একটি প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব। আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে মানুষের হাতে পৃথিবীর শাসন কতৃত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষের হাতকে ক্ষমতাশালী করে দিয়েছেন। তার কাছে ন্যাস্ত করেছেন নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রন ও সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান শক্তি ও খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন এবং গোটা সৃষ্টি জগতকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে আপন অনুগত করার খোদায়ী ইচ্ছা বাস্তবায়নের ক্ষমতা। এটাই ছিল আল্লাহ কতৃক তার কাছে অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এ দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সকল সুপ্ত শক্তি এবং সকল গুপ্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করলেন যাতে সে পৃথিবীর সকল শক্তি এবং তার উপরিভাগ ও অভ্যন্তরে যত সম্পদ রয়েছে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার

www.pathagar.com

করতে পারে। আর আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার প্রয়োজন তাও তাকে দিলেন। আর এভাবে পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের সকল শক্তির সংগে মানুষের পরিপূর্ণ সমন্বয় ও সাজুয্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির সংঘাত বেধে না যায় এবং এই বিশাল বিশ্বে মানুষ ধ্বংস হয়ে না যায়। আল্লাহ তায়ালা কতৃক আদম (আঃ) ও ফেরশতাদের মাঝে গৃহীত জ্ঞানের পরীক্ষা হতে এসত্য দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠে। জ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অর্জন করেছে এক সুমহান মর্যাদা। এ প্রশস্ত পৃথিবীতে সে হয়ে দাঁড়ালো সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান সৃষ্টি।

আমরা আমাদের সচেতন স্নায়ুমন্ডলী ও উন্মুক্ত অন্ত র্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো মানব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি ভাংগা-গড়ার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী যা কিছু অর্জন করেছে সবই আল্লাহর নব্য সৃজিত প্রতিনিধি মানুষের হাতেই সংঘটিত হয়েছে। মানুষই এসবের পিছনে প্রধান নিয়ামক শক্তি। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রয়োগ করে উন্নতি-অগ্রগতি ও সভ্যতার এ স্তরে উন্নীত হয়েছে।

এহেন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা মনোনীত করার খোদায়ী প্রস্তাব শুনে ফেরশতারা প্রভুকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে যাচ্ছেন যে সেখানে অনাচার ও অরাজকতা বিস্তার করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরাতো আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষনায় ব্যাপৃত আছি'। ফেরশতাদের এ প্রতিক্রিয়া শুনে আমাদের মনে হতে পারে যে, তারা আল্লাহর প্রস্তাবে খুশী হতে পারেনি। বিষয়টা আসলে এমন নয়। তাদের কাছে এমন কিছু তাৎক্ষনিক সাক্ষ্য প্রমান ছিল অথবা অতীতের সঞ্চিত এমন কিছু অভিজ্ঞতা ছিল কিংবা এমন কিছু প্রজ্ঞাজাত ধ্যান ধারনা ছিল যা দ্বারা তারা এই নতুন সৃষ্টির স্বভাব প্রকৃতি কিংবা পৃথিবীতে তার জীবন যাপনের অনিবার্য ফল হিসেবে কী সংঘটিত হবে তা আঁচ করতে পেরেছিল। তারা হয়তো বুঝতে পেরেছিল কিংবা আশংকা করেছিলো যে, সে পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়াবে ও রক্তপাত ঘটাবে। ফেরশতারা নিষ্পাপ স্বভাববশতঃ নির্ভেজাল কল্যান ও পরিপূর্ণ শান্তি ছাড়া আর কিছু হয়তো ভাবতেও পারেনা। আর এজন্যই হয়তো তারা মনে করে আল্লাহর প্রশংসা, গুনাগুন ও পবিত্রতা ঘোষণা করা ছাড়া কোন সৃষ্টির জন্মের আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা, আর এটাই কারো সৃষ্টির প্রথম ও একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এ কাজ তো তাদের দ্বারাই সমাধা হচ্ছে।

ফেরেস্তাদের আনুগত্যশীলতার কারণে তারা আল্লাহর এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। তাদের জানা ছিলনা পৃথিবীর সৃষ্টি, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন, জীবনের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি, স্রষ্টার ইচ্ছা ও প্রকৃতির নিয়ম বাস্তবায়ন, প্রকৃতির উন্নয়ন ও সংশোধন ইত্যাদি কাজ আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত খলীফার হাতে সমাধা হওয়ার মধ্যে কী রহস্য ও কী বিচক্ষণতা নিহিত রয়েছে। আল্লাহর এই খলীফা কখনো দাংগা ফাসাদে

www.pathagar.com

লিপ্ত হতে পারে, কখনো রক্তপাতও ঘটাতে পারে। কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান আংশিক অকল্যান ও অনাচারের মধ্য দিয়ে সে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর কল্যাণ সাধনও করে থাকে। স্থায়ী উন্নতি ও অপ্রতিহত প্রগতিও অব্যাহত থাকে। এ কারণেই মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব আসে ঃ 'আমি যা জানি তোমরা তা জাননা'।

এ প্রসংগে আরও উল্লেখ্য যে, মানুষের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীতে যেসব রকমারী সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল, তারা সকলে (সম্ভবত জ্বিন জাতি ব্যতীত) জন্মগত ও স্বভাবগত ভাবে আনুগত্যশীল ছিল। যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা তাদের দেয়া হয়নি। যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে একটা সুনির্দিষ্ট আইন ও শৃংখলার অধীনে তা সম্পন্ন করবে এবং বিন্দুমাত্রও অবাধ্যতা প্রদর্শন করবেনা এটাই ছিল তাদের কর্তব্য। তাদের মধ্যে ফেরেশতারা ছিল শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

"আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু আদেশ করেন, তারা তার অবাধ্য হয়না। যা করতে বলা হয় তারা অবলীলাক্রমে তাই করে।" (তাহরীম - ৬)।

অনুরূপভাবে আকাশে বিদ্যমান বিশালাকায় বস্তুরাজিও আল্লাহর সম্পূর্ণ অনুগত ছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ঃ

"সূর্য আপন গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক মহা পরাক্রান্ত মহাবিজ্ঞানীর পরিকল্পনা এটা। চাঁদের প্রদক্ষিণ পথও আমি ঠিক করে দিয়েছি। ফলে এক সময়ে সে তার প্রথম বক্র দশায় প্রত্যাবর্তন করে। সূর্যের সাধ্য নেই যে, চাঁদকে ধরে। রাতেরও সাধ্য নেই যে, সে দিনের আগেই চলে আসে। সকলেই সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে একই শূন্যালোক।" (ইয়াসীন ঃ ৩৮-৪০)

আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির অবস্থাও ছিল তদরূপ। এ প্রসংগে কোরআনের বাণী ঃ

"সকলেই তার আজ্ঞাবহ।" (রুম ঃ ২৬)

"আপন প্রতিপালকের আনুগত্যের ব্যাপারে তারা দাম্ভিকতাও প্রদর্শন করেনা, ক্লান্তও হয়না। দিনরাত তাসবীহ করে একটুও বিশ্রাম নেয়না।" (আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)।

অতঃপর মহান স্রষ্টা আল্লাহ মনস্থ করলেন আপন সৃষ্টি জগতের মধ্য থেকে কোন এক সৃষ্টিকে খিলাফাতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করবেন যা তখন পর্যন্ত অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির সামনে এ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বটি পেশ করলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই এ গুরুদায়িত্ব বহনে তাদের অপারগতা ও অক্ষমতা ব্যক্ত করলো। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ আপন সৃষ্টির আধুনিকতম সংস্করণ প্রকাশ করলেন, যার নাম মানুষ। এই মানুষ সামনে অগ্রসর হয়ে খিলাফাতের দায়িত্বটি গ্রহণ করলো, যা গ্রহণ করার যোগ্যতা ও সাহস অন্য কোন সৃষ্টির

www.pathagar.com

ছিলনা। মহা গ্রন্থ আলকোরআনে আল্লাহ তায়ালা এ সত্যটি প্রকাশ করেছেন যে ভাষায় তা হলো-

"আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের সামনে আমানত, বা গুরুদায়িত্ব পেশ করালম। তারা সকলেই তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং ঘাবড়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো।" (আহযাব ঃ ৭২)

কোরআনের উপরোক্ত ঘোষণায় অন্যান্য সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত এই কটা সৃষ্টিকে উক্ত গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য বাছাই করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কারণ এগুলো এত বড় যে, মানুষ এগুলোর ভেতরে বা আশে পাশে বাস করে এবং এগুলোর তুলনায় মানুষকে খুবই ছোট ও নগন্য মনে হয়। এসব বড় বড় সৃষ্টি তাদের স্রষ্টাকে কোন প্রকার চেষ্টা ছাড়াই চেনে এবং তার সেই সব নিয়ম-কানুনের আনুগত্য করে, যা সৃষ্টিগত ভাবেই তার উপর আরোপ করা হয়েছে। তারা কোন ইচ্ছা বা অনুভূতি ছাড়াই তাদের স্বভাব প্রকৃতি অনুসারেই আপন আপন ভূমিকা পালন করে।

মানুষের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাকে অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ নিয়মের আওতায় আল্লাহর আইন ও বিধানের অধীন করার পাশাপাশি এমন একটি শক্তিও দেওয়া হয়েছে, যার বলে সে একটা নির্দিষ্ট গন্ডীতে বাধ্যতামূলক আনুগত্য থেকে মুক্ত। সে তাঁর নিয়ম কানুনের আনুগত্য করে আপন প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ও বোধশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। ইচ্ছা হলে সে অবাধ্যতা ও নাফরমানিও করতে পারে। এটি হলো মানুষকে আল্লাহ কতৃক প্রদত্ত চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। এ সম্পর্কে আলকোরআনের বাণী ঃ

" আমি তাকে এই দুনিয়ায় চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে চাইলে হেদায়তের পথে চলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হতে পারে, আবার চাইলে বিরোধীতার পথে চলে অকৃতজ্ঞ ও কাফের হয়ে যেতে পারে।" (আদ্ দাহর ঃ ৩)

আর এ কারণেই আমরা যেমন অনুগত বান্দাহ খুঁজে পাই, তেমনি অবাধ্য ও নাফরমান বান্দাও দেখতে পাই। আবার একই ব্যক্তিকে আনুগত্য ও নাফরমানী করতে দেখতে পাই। পবিত্র কোর আন অধ্যয়নে আমরা জানতে পারি যে, মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যে আনুগত্য করলে পুরস্কৃত হবে এবং নাফরমানী করলে শাস্তি পাবে। এ প্রসঙ্গে কোর আনের বাণী ঃ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে এমন বেহেশ্ত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে নদী-নালা সমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে এ লোকেরা চিরদিন থাকবে। বস্তুতঃ এটা বিরাট সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর রাসুলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর সীমালংঘন করবে, তাকে আল্লাহ দোজখে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে সে চিরদিন বসবাস করবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।" (নিসা ঃ ১১-১৪)।

www.pathagar.com

মানুষ ও খিলাফাত শীর্ষক উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সত্য দেদিপ্যমান যে, মানুষ সৃষ্টি জগতে আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদাবান সৃষ্টি। পৃথিবীতে সে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলীফা)। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের সে-ই মালিক এবং পৃথিবীতে তারই নেতৃত্ব ও কতৃত্ব চলবে, আর এজন্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে পৃথিবীর ঘটনাবলীতে এবং তার বিকাশ ও বির্বতনে তার ভূমিকাই প্রধান। সে ভূমিরও অধিপতি যন্ত্রপাতিরও অধিপতি। আজকের জড়বাদী সভ্যতার মত সে যন্ত্রের দাস নয়। যন্ত্র মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কও তাদের প্রকৃত অবস্থার মাঝে যে পরিবর্তন এনেছে, মানুষ তার তল্পীবাহক ও অন্ধঅনুসারী নয়, যদিও বস্তুবাদী ও জড়বাদী সভ্যতার তল্পীবাহকরা এই দাবীই করে থাকে। তারা মানুষের ভূমিকা ও কর্মকান্ডকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তাই তাকে অচেতন যন্ত্রের গোলাম বানিয়ে দেয়। অথচ সে হচ্ছে মহা সম্মানিত নেতা, আল্লাহর খলীফা, কোন বস্তুবাদী মূল্যবোধ মানুষের চেয়ে অধিক মূল্যবান হতে পারে না এবং তাকে মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়া যায়না। আর মানুষকে অবমূল্যায়ন করে মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয় এমন কোন বিষয় যতই বস্তুগত সমৃদ্ধির কারণ হোকনা কেন, তা মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের বিরোধী। আর এ কারণেই সব কিছুর আগে ওসব কিছুর উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে মানুষের মর্যাদাও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে। আর এ মর্যাদা হলো খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা।

(ঘ) মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। খেলাফাতের দায়িত্ব অর্পন কালে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞানের এই রত্ন ভান্ডারের মালিকানা দান করেন। এ মহামূল্য জ্ঞানের কল্যানেই প্রথম মানুষ আদম (আঃ) ফেরেশতা মন্ডলী হতে শ্রেষ্ঠ প্রমানিত হয়ে প্রতিনিধির উপযুক্ত বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। মানুষকে যে পদ্ধতিতে এ জ্ঞান ভান্ডারের মালিকানা দেয়া হয়েছে তা আলকোরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, "আল্লাহ তায়ালা অতঃপর তার প্রতিনিধি আদমকে সব ধরণের নাম শিখিয়ে দিলেন। পরে এক পর্যায়ে তিনি তা ফেরেশতাদের কাছে পেশ করেও বললেন ঃ আমার প্রতিনিধি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে দেখি তোমরা এ নামগুলো বলো তো ? ফেরেশতারা বললো, একমাত্র আপনিই পবিত্র, আমরাতো শুধু সে টুকুই জানি যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সবকিছুর জ্ঞান ও গুনতো একমাত্র আপনারই জানা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এবার আদমকে বললেন, সে সব জিনিসের নাম ফেরেশতাদের বলে দিতে। আদম ফেরেশতাদের নামগুলো সুন্দরভাবে বলে দিলেন। এবার আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান জমিনের যাবতীয় গোপন রহস্য জানি। তোমাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্য আমি ভালোভাবেই অবগত আছি।"

www.pathagar.com

মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবী ও আকাশের হাজারো সৃষ্টি সম্পর্কে নানামুখী জ্ঞান দানে ধন্য করেছেন। এ জ্ঞানই হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের প্রধান হাতিয়ার। আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের মাঝে জ্ঞানের পরীক্ষায় আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতের সামনে জ্ঞানের যে দিগন্ত উন্মোচন করেছেন তা হলো, নাম দ্বারা নির্দিষ্ট জিনিসকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা, ব্যক্তি ও বস্তুর নাম রাখার ক্ষমতা এবং সেই নামকে ঐ ব্যক্তি বস্তুর সংকেত চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া। পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ক্ষমতা। মানুষ এভাবে জিনিসের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করতে না পারলে কিরূপ জটিলতা দেখা দিত, তা কল্পনা করলেই এই ক্ষমতার মূল্য কত তা আমরা বুঝতে পারি। পারস্পরিক লেনদেন ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কি দুঃসহ ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, তা একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কোন বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে সেই জিনিসটাকে হাজির করতে হতো। অন্যথায় সমগ্র কথাটাই দুর্বোধ্য থেকে যেতো। মনে করুন একটি উড়োজাহাজ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তাহলে উড়োজাহাজটিকে সামনে হাজির করতে হতো। নদ-নদী, সাগর- মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি নিয়ে কথা বলতে চাইলে সেগুলোকেও সামনে হাজির করতে হতো। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলতে চাইলে সেই ব্যক্তিকে হাজির করতে হতো। ফলে এ সমস্যা এত কঠিন ও জটিল রূপ ধারণ করতো যে, আল্লাহ মানুষকে নাম ব্যবহারের ক্ষমতা না দিলে তাদের সমগ্র জীবনই দুর্বিসহ হয়ে পড়তো। ফেরশতাদের এ গুনটির কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের দায়িত্ব পালনে নামের কোন আবশ্যকতা নেই। তাই এ জ্ঞান তাদেরকে দেয়া হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর নাম শিখিয়েছেন বলে কেবলমাত্র কোন জিনিসের নামের মধ্যেই উক্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রত্যেক বস্তুর আভ্যন্তরীণ গঠন, তার মাঝে নিহিত শক্তি ও ক্ষমতা, উপকারিতা ও অপকারিতা ইত্যাদি বহুমুখী জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। মানুষ বাহু বলে নয় বরং তার জ্ঞানকে কাজ লাগিয়ে আদিকাল থেকে অদ্যাবধি হাজারো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। মানুষকে তার জ্ঞানের শক্তি দিয়েই তার চেয়ে বহুগুন শক্তির অধিকারী ও হিংস্র প্রাণীকে নিজের আয়ত্বে আনতে এবং আপন কল্যানে কাজে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ পানিকে বিদ্যুতে, লোহাকে ট্রেন, জাহাজ ও বিমানে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ করে মানুষ রেডিও টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোনসহ হাজারো কল্যাণ ধর্মী আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এ জ্ঞানের অস্ত্র দিয়েই মানুষ তৈরী করেছে আনবিক বোমাসহ হাজারো ধরণের মারনাস্ত্র। এ জ্ঞানের বলেই নানা প্রকার ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম আবিষ্কার করে মানুষ রোগ-জরাকে প্রতিরোধ করছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ আরও কত কি যে অবিষ্কার করতে সক্ষম হবে মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই সে বিষয়ে ভালো জানেন।

www.pathagar.com

উন্নত বিশ্ব হিসাবে পরিচিত ইউরোপ ও আমেরিকার যেসব দেশ বর্তমানে বস্তুগত উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে তাও এই জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলাফল। এক সময় মুসলিম জাতি বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল তাও এই জ্ঞানগত উৎকর্ষকতার কারণে। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশে সকল কালে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তার মূলে ছিল জ্ঞানগত উৎকর্ষতা। আর এজন্যেই প্রিয় নবীর (সাঃ) মাধ্যমে আল্লাহর প্রথম বাণী ঃ

"(হে নবী !) পাঠ করুন আপনার পালন কর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু- যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতোনা।" (আলাক ঃ ১-৫)

নবুয়াতের অন্যতম মিশন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হতে আমরা তা জানতে পারি।

"তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।" (আল-জুমুআ- ঃ ২)

অতএব, এ জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সম্পদ নাই। আলকোরআনে মহান আল্লাহর ভাষায় ঃ

"যাকে হিকমত (জ্ঞান-বিজ্ঞান) দান করা হয়েছে তাকে অতি উত্তম সম্পদ দেয়া হয়েছে।" (আল বাকারা ঃ ২৬৯)

আবার আল্লাহ প্রাপ্তিরও পথ হলো এই জ্ঞান। কোরআনের ভাষায় ঃ

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে যথার্থ ভয় করে থাকে।" (ফাতির ঃ ২৮)

আর এ কারণেই নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য ইসলাম বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ করেছে। প্রিয় নবীর (সাঃ) বাণীঃ "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য"।

(ঙ) মানুষ, ইবলীস ও ফেরশতা

আদম (আঃ) এর সৃষ্টি কাহিনীতে আমরা আল্লাহ তায়ালার তিন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির পরিচয় পাই। এগুলো হলো ফেরেশতা, মানুষ ও ইবলীস। আমরা দৃশ্যপটে সর্বাগ্রে যাদের মুখামুখি হই তারা হলেন আল্লাহর ঘনিষ্টতম সৃষ্টি ফেরশতাকুল। তারা হলো পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের প্রতীক। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয়না এবং আল্লাহ তাদেরকে যখন যে নির্দেশ দেন তারা সংগে সংগে তা পালন করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নুর হতে ফেরশতাদের সৃষ্টি করেন। মানুষ সৃষ্টির আগে তাদের চেয়ে উন্নত ও মর্যাদাবান আর কোন সৃষ্টি জগতে ছিলনা।

www.pathagar.com

কাহিনীর দৃশ্যপটে আমাদের পরিচয় ঘটে আমাদের নিজ সত্তা অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষের সংগে। আমরা জানতে পেরেছি মানুষ দুই ভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একটি হলো মাটি আর অন্যটি হলো আল্লাহর রূহ। আর মাটি ও রূহের সমন্বয়ে সৃষ্ট মানুষকে আল্লাহ তায়ালা আনুগত্য ও নাফরমানী উভয় শক্তি দান করেছেন। তারা চাইলে তাদের স্বাধীন বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা হতে পারে, আবার তারা ইচ্ছা করলে তাঁর নাফরমানী করে তাঁর অবাধ্যও হতে পারে। মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ আনুগত্য করে তখন সে মর্যাদার ক্ষেত্রে ফেরশতাদের উর্ধ্বে পৌঁছে যায়। আর যখন আল্লাহর নাফরমানী করে তখন পশুর চেয়েও নীচু স্তরে নেমে যায়।

কাহিনীতে তৃতীয় পর্যায়ে আমরা যার মুখোমুখি সে হলো আল্লাহর অবাধ্য ও মানুষের চির শত্রু ইবলিস। তার সংগে আমাদের পরিচয় ঘটছে আল্লাহর নাফরমান ও অহংকারী রূপে। আল্লাহ তাকে আদেশ করেছেন আদম (আঃ) কে সেজদা করতে কিন্তু সে তা করেনি। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোকে বারণ করলো, সেজদা করিসনা, যখন আমি তোকে নির্দেশ দিলাম। সে বললো, আমি ওর থেকে ভাল। সৃষ্টি করেছেন আপনি আমাকে আগুন থেকে আর সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটি থেকে। এভাবে ইবলিস শুধুমাত্র অবাধ্যতা ও আনুগত্যহীনতারই পরিচয় দিলনা সে অহংকার বশতঃ ঔদ্বত্যেরও প্রকাশ ঘটালো। আল্লাহ তার প্রতি অভিসমপাত করলেন এবং তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন।

এখানে একটি বিষয় জেনে নেয়া দরকার আর তা হলো, ইবলিস আল্লাহর খুব কাছাকাছি অবস্থান করে তাঁর ক্ষমতা ও গুনাবলী সম্পর্কে ভালভাবে জানতো। কিন্তু এগুলি তার কোন কাজে লাগেনি। কারণ হলো, যে বিষয়ে আল্লাহ তাঁর ফয়সালা দান করেছেন অর্থাৎ আদমকে (আঃ) সেজদা করার জন্য তাকে আদেশ করেছেন, সে তা করতে অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে সে তার বুদ্ধি কাজে লাগিয়েছে। তার বুদ্ধিতে মানুষের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। ফলে সে কাফের হয়ে গেছে। মানুষের মধ্যেও যারা কোনো বিষয়ে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট ফয়সালা থাকা সত্বেও নিজেদের ইচ্ছা ও চিন্তার অনুসরণ করে তাদের পরিনতিও ইবলিসের ন্যায়। কেননা, তারা ইবলিসের অনুসারী, তার সাংগ পাংগ। আর ইবলিসের অন্য নাম হলো শয়তান। আমাদের কাছে সে শয়তান হিসাবেই অধিক পরিচিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ফেরেশতারা হলো নুরের সৃষ্টি, মানুষ মাটি ও আল্লাহর রূহের তৈরী এবং ইবলিস হলো আগুনের তৈরী। অতএব ইবলিস যে ফেরেশতা ছিলো না সেটাই লক্ষণীয়। বরং সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহে ফেরশতাদের দলভুক্ত। তাহলে ইবলিস কে? ইবলিস হলো জ্বিনদের বংশধর। আমরা আদম কাহিনীর সুরা আল হিজরের বর্ণনা হতে এ তথ্য অবগত হই। আল্লাহ বলেন, অবশ্যই আমি মানুষকে বানিয়েছি ছাঁচে ঢালা মাটির শুকনো মন্ড থেকে এবং তারও আগে আমি

www.pathagar.com

জ্বিনদের সৃষ্টি করেছি আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে। ইবলিসের জ্বিন হওয়া সম্পর্কে কোরআনের অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই ইবলিস ছিল জিন জাতির একজন। অতপর সে তার মালিকের হুকুম অমান্য করলো। ইবলিস আগুনের সৃষ্ট হওয়ায় আদমকে (আঃ) সেজদা করা থেকে বিরত থাকে এবং অহংকার প্রকাশ করে। মানব জাতির পূর্বে পৃথিবীতে জ্বিনদের বসবাস ছিল। মানুষের ন্যায় জিনদেরকেও আল্লাহ তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আলকোরআনে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমারই ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" (আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

সম্ভবত ইবাদাত করতে করতে আল্লাহর ইচ্ছায় ইবলিসও তার সংগীরা ফেরশতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু মানুষের ন্যায় জ্বিনরাও আল্লাহর নাফরমানী করা ও আনুগত্য না করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী ছিল। এজন্যে ইবলিস তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অভিশপ্ত শয়তানে পরিনত হয়েছে। তবে শয়তান ও অন্য জ্বিনরা মানুষের সমকক্ষ ছিল না এবং তারা আল্লাহর প্রতিনিধি (খলীফা) ও ছিলনা। কারণ তারা শুধুমাত্র বিষাক্ত আগুনের শিখা হতে সৃষ্টি হয়েছিল, পক্ষান্তরে আল্লাহ মানুষকে তৈরী করেন মাটির উপাদান থেকে এবং তাতে ফুঁকে দেন আপন রূহ। আর মানুষকে সৃষ্টি করেন ইবাদাত ও খিলাফাতের জন্য।

আমরা ইবলিসকে অবাধ্যতার সীমা লংঘন করে বিদ্রোহের পর্যায়ে দেখতে পাই। সে আদমকে (আঃ) সেজদা না করে অবাধ্যতার পরিচয় দিয়েছে। আদমের (আঃ) কারণে তার দুরবস্থার কথা স্মরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত আদম (আঃ) ও তার বংশধরদের বিভ্রান্ত করার হায়াত ও ক্ষমতা চেয়ে নিল আল্লাহর কাছ থেকে। এভাবে সে কিয়ামত পর্যন্ত খোদাদ্রোহীতা ও খোদাদ্রোহীদের নেতা বণে গেল। তারই অনুকরণে ইতিহাসের পাতায় ফেরাউন ও নমরূদকে খোদায়ী দাবী করতে দেখা যায়। আজও পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর বন্দেগী হতে বিরত রাখার জন্য বাধার পাহাড় তৈরী করছে, নানামুখী অত্যাচার ও অবিচারের ষ্টীম রোলার চালাচ্ছে তারা শয়তানেরই দোসর, তারা খোদাদ্রোহী।

অতএব উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সৃষ্টি অর্থাৎ ফেরশতাদের দেখতে পাই পরিপূর্ণ ও সার্বিক আনুগত্য ও গভীরভাবে মেনে নেয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে। শয়তানকে দেখতে পাই পরিপূর্ণ নাফরমানী ও অহংকারের প্রতীক রূপে। আর মানুষের পরিচয় পাই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী আনুগত্য ও নাফরমানীর ক্ষমতা সম্পন্ন মর্যাদাপূর্ণ সৃষ্টি আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি রূপে, যার খেদমতের জন্য আল্লাহ পৃথিবীর যাবতীয় বস্ত নিচয় সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি এমনকি ফেরস্তাদেরও করেছেন তার অনুগত।

www.pathagar.com

(চ) মা হাওয়ার সৃষ্টি

আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পর আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। জান্নাতের বাগানে তার সংগী হিসাবে একজন নারীর প্রতি প্রথম বারের মত আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ নারী অন্য কেউ নন, তিনি হলেন মানব জাতির আদি মাতা অর্থাৎ আদি পিতা আদম (আঃ) এর জীবন সংগীনী বিবি হাওয়া। তিনি পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট জীবের ন্যায় আদম (আঃ) এর জোড়া হিসাবে জান্নাতে তার সংগে অবস্থান করছিলেন। আমরা জানিনা মা হওয়া কিভাবে বাস্তব জীবনে এলেন। এ প্রসঙ্গে আদম (আঃ) এর পাঁজর থেকে মা হাওয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে একটি ইসরাইলী মত প্রচলিত আছে এবং হাদীসেও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা আল্লাহর সৃষ্টি দর্শনের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। তিনি জগতে সবকিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাণী, "আমি মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছি প্রত্যেকটা জিনিসকে জোড়া জোড়া, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।" আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা হাওয়া (আঃ) কে আদম (আঃ) এর জোড়া হিসাবে অস্তিত্বদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে আল্লাহ তায়ালার এ বাণীটি নিয়ে চিন্তা করলে হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়।

"হে মানব মন্ডলী। তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন, তা হতেই তার জোড়া তৈরী করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (আন্ নিসা ঃ১)

কোরআনের এ আয়াতটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হলে ঈসরাইলী মতের আংশিক সমর্থন মিলে, আর তাহলো হাওয়া (আঃ) এর অস্তিত্ব আদম (আঃ) এর সত্বা থেকে এসেছে। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের ক্লোনিং পদ্ধতির সংগে সুর মিলিয়ে বলতে পারি যে, বিবি হাওয়া আদম (আঃ) থেকে এ পদ্ধতিতে অস্তিত্ব লাভ করে থাকতে পারেন। আল্লাহর পক্ষে এটা অসম্ভব কিছুই নয়। আমরা আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ফলবান বৃক্ষের কলম পদ্ধতি কিংবা কলাগাছের বংশ বিস্তারের দিকে তাকালে এ বিষয়টির যৌক্তিকতা খুঁজে পেতে পারি। অবশ্য অদৃশ্য জগতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

আদম (আঃ) হতে হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টির বিষয়টি আমরা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি, আর তাহলো একই উপাদান থেকে উভয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আবেগ অনুভূতিসহ সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। আদমকে যেমন মাটির উপাদান ও আল্লাহর রূহের সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে হাওয়া (আঃ) কেও তাই করা হয়েছে।

এখানে ইসরাইলী মতটি আলোচনার দাবী রাখে। কারণ আমাদের আলেম সমাজ উক্ত মতটির ভিত্তিতে ওয়াজ নসিহত করেন এবং মহিলাদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণার প্রচার করে থাকেন। এক্ষেত্রে রাসুল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসও ভালোভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

www.pathagar.com

হাদীসে রাসুল ঃ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা মেয়েদেরকে উপদেশ দিতে থাক, কেননা মেয়েরা পাঁজরের হাড় থেকে সৃজিত হয়েছে। আর পাঁজরের উপরের হাড়টিই হলো সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি তাকে সোজা করতে চেষ্টা কর, তবে তা ভেঙ্গে যাবে, আর যদি ওভাবে রেখে দাও তবে তা বাঁকা অবস্থায়ই থাকবে। সুতরাং তোমরা মেয়েদেরকে উপদেশ দিতে থাক।" (বোখারী ও মুসলিম)

"আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মেয়েরা পাঁজর থেকে সৃজিত হয়েছে এবং তারা কখনো সরল পথ অবলম্বন করেনা। বক্র অবস্থায় তাদের থেকে কাজ হাসিল করে নাও। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে যাবে। আর ভাঙ্গার অর্থ হলো বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক।" (মুসলিম)

প্রিয় নবীর উপরোক্ত হাদীস দুটির সরলার্থের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা আদম (আঃ) এর পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করতে পারি। এজন্য কোন জ্ঞান গবেষণার প্রয়োজন হয়না। মূলত এটি একটি রূপক বক্তব্য। এখানে নারী প্রকৃতির ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। তার দেহ নয় বরং তার স্বভাব প্রকৃতিকে পাঁজরের হাড় যা আতিশয় বক্র ও ভঙ্গুরতার সংগে তুলনা করা হয়েছে। আর এ তুলনার মাধ্যমে নারী বিশেষ করে স্ত্রীদের সংগে যথা সম্ভব ভদ্র ও ভারসাম্যমূলক আচরণ করার দিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেননা নারী জাতির মাঝে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাচুর্য বিদ্যমান। তারা যুক্তির পরিবর্তে আবেগ দিয়ে সমস্যার সমাধান পেতে অভ্যস্ত। তাই তাদের সংগে কোন বিষয়ে যুক্তি তর্কের আশ্রয় নিলে অশান্তির কারণ ঘটে, এমনকি দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয় এবং পরিনতিতে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটতে পারে। প্রিয় নবী তাঁর হাদীসে স্ত্রীলোক পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী এবং এ হাড়গুলো হলো বাঁকা, আর উক্ত হাড় সোজা করতে গেলে সেগুলি ভেঙ্গে যাবে দ্বারা এসত্যের প্রতি ইংগিত করেছেন। অতএব প্রিয় নবীর (সাঃ) হাদীসের কদর্থ করে কোন ভাবেই আপন মা, কণ্যা, বোন ও স্ত্রীর সম্মানের হানি করা ঠিক হবেনা, আর এরূপ করা সত্যিই অন্যায়। এরূপ প্রচারণা নারী ও পুরুষের মাঝে দ্বন্দ ও সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে, যেটা আমরা বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় প্রত্যক্ষ করছি।

(ছ) আদম (আঃ) এর জান্নাতে অবস্থান ও মানুষের পরীক্ষা

আদম (আঃ) পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বের জন্য সৃষ্টি হলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টির পর পরই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই। তার সংগিনী হাওয়াসহ জান্নাতে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। আমরা জানিনা জান্নাত কোথায়। তবে তা ছিল তাদের বসবাসের উপযোগী সুখ-স্বাছন্দে ভরা। সেখানে ক্ষুধা

www.pathagar.com

তৃষ্ণায় কষ্ট ভোগের কোন সুযোগ ছিলনা এবং প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদেরও সংকট ছিলনা। কিন্তু কোন কারণে তাদের জান্নাতের বাসস্থান যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় তবে তাদেরকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পোষাক পরিচ্ছদের কষ্টে পড়তে হবে বলে আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আদমের চিরশত্রু ইবলিস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয় ফলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে'।

পৃথিবীতে প্রেরণ না করে আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে থাকতে দেয়ার পেছনে আল্লাহ তায়ালার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। আর তাহলো পৃথিবীতে তাঁর খালিফা কিভাবে তার উপর অর্পিত খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করবে সে ব্যাপারে তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করা। কারণ আল্লাহ তায়ালা জানতেন, মাটির পৃথিবীতে পদার্পনের সংগে সংগে মাটির উপাদানে সৃষ্ট মানুষ মাটির আকর্ষণে নানা প্রকার পশু সুলভ কাজ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এছাড়া চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়ায় উক্ত স্বাধীনতার ভুল ব্যবহারের ফলে নানা পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে। মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব ও খিলাফাতের জন্য সৃষ্টি করা হলেও তারা মানুষের প্রভু হয়ে বসবে বা দাস হয়ে পড়বে। আর এক্ষেত্রে শয়তান হলো মানুষের চিরশত্রু। সে তার ঘোষণা মোতাবেক সদা-সর্বদা তার দল-বল নিয়ে মানুষকে খোদাদ্রোহীতার পথে চালিত করার কাজে লিপ্ত থাকবে। মানুষের প্রবৃত্তির তাড়না এবং শয়তানের উসকানি থেকে বাঁচতে হলে মানুষের রূহানী সত্বার সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। মানুষের রূহানী সত্বাকে সদা জাগ্রত রাখা দরকার। আর এটা সম্ভব আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহর আদেশ নির্দেশের শর্তহীন আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে নিজের খোশ খেয়াল অথবা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন সুযোগ নেই। আর এটা সম্ভব হয় ধারাবাহিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ফলে। এজন্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়। আর এ কারণে আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) ও হাওয়াকে জান্নাতে রেখে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) ও তার সহধর্মিনীকে জান্নাতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং সকল বস্তু উপভোগের সুযোগ দান করেছেন। তাদের পরীক্ষার জন্য শুধুমাত্র একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন এবং আদম (আঃ) এর নিকট হতে এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করে। সে তাদেরকে যেভাবে প্ররোচিত করে তাহলো, 'তোমার কি জানো তোমাদের মালিক তোমাদেরকে এই গাছটির কাছে যাওয়া যে নিষেধ করেছেন, তার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এখানে গেলে তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এর ফলে তোমরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সে তাদের কাছে আস্থাভাজন হবার জন্য কসম করে বললো, দেখো আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্য তোমাদের হিতাকাংখীদের একজন (আরাফ)'। সুরা তাহায় বলা হয়েছে, 'শয়তান

www.pathagar.com

বললো, হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবন দায়িনী একটি গাছের কথা বলবো যার ফল খেলে তুমি চিরঞ্জীব হবে এবং বলবো এমন রাজত্বের কথা- যার কখনো পতন হবে না'।

কিন্তু আদম (আঃ) খোদায়ী পরীক্ষার ব্যাপারে সচেতনতার অভাবে এবং চিরস্থায়ী জীবন ও ক্ষমতা লাভের মানবীয় দুর্বলতার কারণে শয়তানের পাতানো ফাঁদে আটকা পড়েন। তিনি তার সংগিনীসহ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে আল্লাহর সংগে কৃত ওয়াদা ভংগ করেন। তারা তাদের অবাধ্যতার ফলে নিজেদের উপর জুলুম করেছে। তারা একাজ করেছেন তাদের স্বভাবজাত মানবীয় দুর্বলতার কারণে। আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলো গেলো, যা ইতিপূর্বে তাদের কাছে গোপন ছিল। তারা লজ্জিত হলেন। নিজেদের ভূল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহর নিকট কৃত পাপের জন্য তওবা করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তারা পূনরায় আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হন। কিন্তু তাদেরকে জান্নাতে থাকার সুযোগ না দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, সাথে শয়তানও। কেননা পৃথিবীর খিলাফাতের জন্যেই আদমের (আঃ) সৃষ্টি। তাকে জান্নাতে রাখা হয়েছিল শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য।

এখন দেখা যাক আল্লাহর পক্ষ হতে আদমের (আঃ) পরীক্ষার স্বরূপ কি ছিল। আমাদের বিবেচনায় এ পরীক্ষাটা ছিল আল্লাহর প্রতিনিধির জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিমূলক। এছিল তার ব্যক্তি সত্তায় বিদ্যমান সুপ্ত শক্তি ও ক্ষমতাকে জাগ্রত করার ব্যবস্থা। গোমরাহী ও নাফরমানীর পথ গ্রহণ করলে কী পরিনাম ভোগ করতে হয় এবং কিরূপে অনুতপ্ত হতে হয়। শত্রুকে কিভাবে চিনতে হয় এবং কিভাবে আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়, এটি ছিল তারই প্রশিক্ষণ।

নিষিদ্ধ গাছ, শয়তানের পক্ষ থেকে তার ফল আস্বাদনের প্ররোচনা, আল্লাহর অংগীকার ভুলে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া, তারপর বিভ্রান্তির ধুম্রজাল কেটে গেলে সচেতন হওয়া, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনার এই সমগ্র কাহিনী মানব জাতির প্রত্যেক প্রজন্মের অভিজ্ঞতা। যুগে যুগে ঘুরে ফিরে মানব জাতি অবিকল এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করে থাকে। আর আল্লাহ হলেন মানব জাতির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের ভান্ডার। তাই তাঁর এই নতুন সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেরই দাবী ছিল যে, তাকে এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তার খেলাফাতের কর্মস্থলে পাঠাবেন। কেননা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এক চিরন্তন সংগ্রামে তাকে লিপ্ত হতে হবে। সেজন্য তাকে সতর্ক সচেতন করে এবং ভালোভাবে প্রস্তুত করে পাঠানো তার রহমতেরই দাবী ছিল।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আয়োজিত উক্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে আল্লাহর খলীফা আদম (আঃ) বাহ্যত ব্যর্থ হন। তিনি শয়তানের

www.pathagar.com

ধোকায় পড়ে তাঁর স্ত্রীসহ নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে নিজের উপর জুলুম করেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যখন তার ভুল বুঝতে পারেন তখন উভয়েই অনুতপ্ত হন এবং তাদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট তওবা ও এস্তেগফার করেন। "তারা বললো হে আমাদের প্রভু, আমরা জুলুম করেছি আমাদের নিজেদের উপর, এখন আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং রহম না করেন আমাদের প্রতি, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব"।

এটাই হচ্ছে মানুষের বিনয় যা মহান আল্লাহ তাঁর খলীফাকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এ বিনয়ই মানুষকে তার প্রভুর নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার দুয়ারগুলো খুলে যায়। মানুষ ভুল করবে, অন্যায় করবে এটা তার জানা, কিন্তু অন্যায় বা ভুল করার পর যখনই সে তা স্বীকার করে ও লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা চায় তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। তার দুর্বলতার অনুভূতি, তার রব এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা, তাঁর রহমত পাওয়া এবং নিশ্চিত এ বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকা যে তাঁর রহমত ও সাহায্য ছাড়া অন্য কারো কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই, আর মিনতির সাথে বলতে থাকা যে তিনি ক্ষমা না করলে অবশ্য অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ততের মধ্যে হয়ে যাবে- এ বিনয় নম্রতাই তাকে ক্ষমা পাওয়ার দিকে এগিয়ে দেয়।

মানুষের এ বিনয়ানুভূতির কারণে আল্ল্যহ তায়ালা আদম (আঃ) এর অপরাধ মাফ করে তাকে নবী হিসাবে মনোনীত করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। তার সংগে মানুষের প্রকাশ্য ও চির দুশমন ইবলিসকেও প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ "আমি বললাম ঃ তোমরা সবাই বেহেস্ত থেকে নেমে যাও। তারপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন পথ নির্দেশ যদি আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই নির্দেশ অনুসরণ করবে, তার কোন ভয় থাকবে না, এবং তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। আর যারা তা অমান্য করবে এবং আমার আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা হবে দোজখের অধিবাসী এবং সেখানে চিরদিন বসবাস করবে"।

আদম (আঃ) এর পৃথিবীতে আগমন প্রাককালে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর পক্ষ হতে হেদায়াত বা জীবন বিধান প্রেরণের আশ্বাস দেন। আরও সুসংবাদ দান করেন মানুষের মধ্যে যারা সেই জীবন বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবন শেষে হারানো জান্নাত ফিরিয়ে দেবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর প্রেরিত জীবন বিধান উপেক্ষা করে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে তাদেরকে পরিনতিতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যুগে যুগে মানুষের মুক্তি ও কল্যানের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নবীদের মাধ্যমে আসা এই চিরন্তন হেদায়েত হলো **ইসলাম**। আর এর বিপরীতে শয়তানের পথের নাম হলো **কুফর**। পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর হতেই ইসলাম আর কুফরের অব্যাহত লড়াই চলছে। এ লড়াইর ক্ষেত্র হলো মানুষ এবং জয় পরাজয়ের পক্ষ - বিপক্ষও মানুষ।

www.pathagar.com

ইসলামের পক্ষের শক্তি হলো হিজবুল্লাহ বা আল্লাহর দল। পক্ষান্তরে কুফরের অনুসারীরা হলো হিজবুশ শয়তান বা শয়তানের দল। চূড়ান্ত বিচারে আল্লাহর দলের লোকেরই জয়ী হবে, আর পরাজিত হবে শয়তানের অনুসারীরা।

(জ) মানুষের লজ্জাশীলতা

আলকোরআনের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পেরেছি যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ফলে আদম ও হাওয়া উভয়ের শরীরের লজ্জাস্থান সমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। এখানে লজ্জাস্থান বলতে উভয়ের বাহ্যিক ও দৃষ্টি গোচর লজ্জাস্থানই বুঝানো হয়েছে যা পরস্পরের নিকট গোপন ছিল। আর এই লজ্জাস্থান উভয়ের নিকট শরীরের সবচেয়ে গোপনীয় অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত ছিল। সেজন্য তা উন্মুক্ত ও নিরাবরণ হয়ে পড়লে উভয়েই বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তা পুনরায় আবৃত করার জন্য গাছের লতাপাতা ব্যবহার করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে উভয়ের মনে কামভাব জন্ম নিয়েছিল। কারণ, কামভাব জন্ম না নিলে সাধারণত মানুষ লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হলে কোন প্রকার লজ্জা অনুভব করেনা, এমনকি সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনা। কিন্তু কামভাব জাগ্রত হলে মানুষ লজ্জাস্থান সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং তা অনাবৃত হয়ে গেলে লজ্জাবোধ করে।

এপ্রসঙ্গে বলা যায়, নিষিদ্ধ বৃক্ষটির ফল খুব সম্ভবত কাপোদ্দীপক ছিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল তাদের মাঝে এই কামভাব বিলম্বে জাগ্রত হোক। তাই তিনি তাদেরকে সেই বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে কৃত ওয়াদা ভুলে যাওয়া এবং তার নির্দেশ অমান্য করার ফলে নিজেদের রব ও স্রষ্টা আল্লাহর সংগে তাদের যে সম্পর্কচ্যুতি ঘটে, তারই অনিবার্য কারণ হিসেবে দৈহিক চাহিদার উদ্ভব ঘটে এবং চরম পরিনতি হিসেবে তাদের মাঝে যৌন আকাংখা সৃষ্টি হয়। ঘটনা অবশ্য অন্য রকমও হতে পারে, আর তা হলো, যখন উভয়ের মাঝে অমর হয়ে থাকার আগ্রহ জাগে তখনই তাদের মাঝে বংশ বিস্তারের উপায় হিসাবে কামভাবও জন্ম নেয়। কেননা, সীমিত ও নির্ধারিত জীবনকাল অতিক্রম করে পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে থাকার এটাই একমাত্র সহজ উপায়। অবশ্য এসবই অনুমান নির্ভর বক্তব্য।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য তাহলো, আদম (আঃ) ও তার স্ত্রী প্রথম বারের মত অনুভব করলেন যে, তাদের কিছু লজ্জাস্থান আছে যা ঢাকা প্রয়োজন। এই জন্যই পরিধেয় বস্ত্র উড়ে চলে যাওয়ার পর যখন তারা উলংগ হয়ে গেলেন দ্রুত তারা নিজেদেরকে ঢাকার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তারা গাছের লতাপাতা জড় করে কাটা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে লজ্জাস্থানগুলো ঢাকতে শুরু করলেন। আর এতে বুঝা গেল মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই লজ্জার একটি অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে এবং

www.pathagar.com

স্বভাবগতভাবেই তারা শরীরের গোপন অংগগুলো ঢাকতে চায়। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষের এই প্রকৃতিগত স্বভাব বিগড়ে গিয়েছিল। বর্তমান আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগে সভ্যতার ইজারাদার জাতিগুলোর মধ্যে লজ্জাহীনতা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এসব সভ্যতার মানুষগুলোর দৃষ্টিতে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ট সৃষ্টি বা তাঁর খলীফা নন। তারা নিজেদেরকে মনে করেন বিবেক বর্জিত উন্নত স্তরের পশু। ফলে তারা খোলা স্থানে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজের শ্রেণী কক্ষে প্রকাশ্য যৌন কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। তাদের অধিকাংশ পশুদের অনুকরণে বিবাহ বহির্ভূত যৌন জীবন যাপন করছে। তাদের মিলনের ফলে সন্তান-সন্ততি জন্ম লাভ করছে। এসব সন্তানের পিতৃ পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না, আর এ নিয়ে তাদের মাথা ব্যথাও নেই। পিতা আপন সন্তানের সংগে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলছে। আরও জঘন্য হলো একই লিংগের মানুষ পরস্পরের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও গীর্জার স্বীকৃতি মিলছে। এসবই মানুষ সম্পর্কে বস্তুবাদী ও পশুসুলভ দৃষ্টি ভংগির ফলাফল।

মানুষের এ নির্লজ্জ দৃষ্টি ভংগী ও আচরণ এখন আর পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী রাষ্ট্র সমূহে সীমাবদ্ধ থাকছেনা। মুসলিম প্রধান দেশগুলোও এ লজ্জহীনতার শিকার হচ্ছে। এখানেও নারী অধিকারের নামে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট দালালরা ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাজে এনজিওদের মাধ্যমে নারীদের জরায়ুর স্বাধীনতার শ্লোগান তুলছে। নারী সমাজকে স্বল্প পোষাক পরিয়ে সংস্কৃতিবান হওয়ার নামে নগ্নতাকে উসকিয়ে দিচ্ছে। ফলে সমাজে ভাংগন অনিবার্য হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে চাইলে মুসলিম নারীদের সামনে অগ্রসর হতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে নগ্নতা ও বেহায়াপনার বিরুদ্ধে। নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে লজ্জাশীলতা ও শালীনতার প্রতিকৃত হিসেবে।

(ঝ) মানুষের সাথে লড়াইয়ে শয়তানের হাতিয়ার

শয়তান মানুষের স্বঘোষিত দুশমন। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সে মানুষের সংগে লড়াই সংঘর্ষের ঘোষণা দেয়। নিজের সৃষ্টি উপাদানের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার বশত সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। আদম (আঃ) কে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অভিশম্পাত করেন, আর অভিশাপের মেয়াদ নির্ধারণ করলেন কিয়ামত পর্যন্ত। শয়তান তার এ দুর্বস্থার জন্য আদম (আঃ) কে দায়ী করলো। সে শপথ গ্রহণ করলো আদম ও তার বংশধরদের বিরুদ্ধে অনন্ত লড়াই ও সংগ্রাম করার। সে ঘোষণা করলো, আমি অবশ্যই মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়বো। শয়তান তার এ লড়াইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে শক্তি-ক্ষমতা এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তায়ালা তা মঞ্জুর করেন।

আল্লাহর মঞ্জুরী পেয়ে সে ঘোষণা করলো, 'যেহেতু তুমি এই আদমের জন্যই আমাকে পথ ভ্রষ্ট করে দিলে আমি অবশ্যই এদের কাছ থেকে

www.pathagar.com

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তোমার সহজ ও সরল পথের বাঁকে ওৎ পেতে বসে থাকবো। অতপর তাদের পথভ্রষ্ট করার জন্যে আমি তাদের কাছে অবশ্যই আসবো- তাদের সামনের দিকে থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাঁ দিক থেকে। সর্বদিক থেকেই আমি তাদের এমন গোমরাহ করার চেষ্টা করবো যে, তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই তোমার নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হিসেবে দেখতে পাবেননা। যে অল্প সংখ্যক লোককে শয়তান গোমরাহ করতে সক্ষম হবেনা তারা হলো আল্লাহর সালেহ বা সৎ বান্দাহ।

আদম (আঃ) কে পদচ্যুত করার পর এ যুদ্ধের ময়দান জান্নাত হতে পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তখন থেকে মানুষ ও শয়তানের মধ্যকার লড়াই অব্যাহতভাবে চলছে। পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে এলড়াই ততদিন চলবে। এ লড়াইয়ে শয়তান তার সকল মারনাস্ত্র ব্যবহার করে চলেছে মানুষের বিরুদ্ধে। শয়তান মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আবার কখনো বা মানুষের আকৃতিতে তার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আবার মানুষরূপী শয়তানের উপর ভর করেও সে তার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক, বন্দুক-কামান, গ্রেনেড-বোমা ইত্যাদি নানা ধরণের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শয়তানের ব্যবহৃত অস্ত্র মানুষের থেকে আলাদা। সে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করে তাহলো- ধোকা, প্রতারণা, প্ররোচনা, লোভ-প্রলোভন ইত্যাদি। আলকোরআনে এসব শয়তানী হাতিয়ারের কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সুরা আল হেজর-এ এক্ষেত্রে শয়তান নিজ মুখে যে অস্ত্র বা হাতিয়ার প্রয়োগের ঘোষণা দান করেছে তাহলো তার ভাষায় 'পার্থিব সামগ্রী সুসজ্জিত করণ'। কোরআনের ভাষায় শয়তান ঘোষণা করলো, হে আমার প্রভু তুমি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করে দিলে, তাই আমি আদম সন্তানদের জন্য পৃথিবীতে সামগ্রী সুসজ্জিত করবোই এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করবোই। তবে তোমার অনুগত ও একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা আলাদা।

শয়তান তার এ ঘোষণার মাধ্যমে মানুষের বিরুদ্ধে তার লড়াই এর ময়দান চিহ্নিত করে দিয়েছে। ময়দানটা হলো পৃথিবী। সে কোন হাতিয়ার দিয়ে লড়াই করবে তাও জানিয়ে দিল। হাতিয়ারটা হলো তাদের সুসজ্জিত করণ। অথাৎ খারাপ কাজকে সুন্দর করে সাজানো এবং সেই কৃত্রিম সৌন্দর্যকে মোহিত করার মাধ্যমে তাকে ঐ খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করা। সুতরাং মানুষ তখনই পাপ করে, যখন শয়তান তাকে পাপ নয় বরং ভালো ও সৎ কাজের আকারে সাজিয়ে দেখায় এবং কাজটা আসলে যেমন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত রূপে তাকে প্রদর্শন করে।

মানবতার বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামে শয়তানের ব্যবহৃত সুসজ্জিত করণ অস্ত্রের পরিনাম ও পরিনতি খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী

www.pathagar.com

হাতিয়ার। বাহ্যিক ভাবে এ অস্ত্রকে অস্ত্র হিসেবে সনাক্ত করা অসম্ভব। গোটা মানব জাতির বিরুদ্ধে লড়াইর হাতিয়ার হিসেবে প্রস্তুত এ অস্ত্র শয়তান সর্বপ্রথম জগতের প্রথম মানুষ আদম ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। শয়তান তার এ অস্ত্র প্রয়োগ করে আল্লাহর প্রতিনিধিকে সস্ত্রীক তাঁর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেছিল। তারা উভয়ে শয়তানের পাতানো জালে আটকা পড়েন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। আর এর ফলে চির শান্তির বাসস্থান জান্নাত হতে বহিষ্কৃত হয়ে তারা দুঃখ কষ্টে ভরা পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হন। তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের উক্ত অস্ত্র প্রয়োগের কোরআন বর্ণিত অভিজ্ঞতার দিকে আমরা আরেকবার দৃষ্টি দিতে চাই।

শয়তানকে তার অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাড়িয়ে দেয়ার পর আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'তুমি এবং তোমার সংগিনী এখন থেকে জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং এর যেখানে যা কিছু তোমরা চাও, তা তোমরা খেতে পারো - কিন্তু এই গাছটির কাছেও যেয়োনা। নতুবা তোমরা উভয়েই জালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। অতপর শয়তান তাদের দুজনকেই কুমন্ত্রণা দিলো যেন তারা একে অপরের কাছে নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহ যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিল- তা প্রকাশ করে দেয়। সে আরো তাদের বললো, তোমরা কি জানো তোমাদের মালিক তোমাদের এই গাছটির কাছে যাওয়া থেকে যে তোমাদের নিষেধ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এখানে গেলে তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এর ফলে তোমরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সে তাদের কাছে আস্থাভাজন হবার জন্যে কসম করে বললো, দেখো আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্য তোমাদের হিতাকাংখীদের একজন। এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত সে এদের দুজনকেই ধোকার জালে আটকে ফেললো। অতপর এক সময় যখন তারা উভয়েই সে গাছ ও তার ফল আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান সমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, সে বন্ধুর বেশে এসে বললো, হে আদম, আমি কি তোমাদের অনন্ত জীবন দায়িনী একটি গাছের কথা বলবো যার ফল খেলে তুমি চিরঞ্জীব হবে এবং বলবো এমন রাজত্বের কথা-যার কখনো পতন হবেনা। অতপর তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলো, সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালার প্রথম অসন্তুষ্টি হিসেবে তাদের শরীরের লজ্জাস্থান সমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো।

এভাবেই একান্ত আপনজনের বেশে, নিতান্ত হিতাকাংখী সেজে বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে শয়তান আদম (আঃ) এর দুর্বল স্থানে আঘাত হানে। মানুষের প্রকৃতিতে বিদ্যমান চিরস্থায়ী বাদশাহী ও অমর জীবনের চাহিদা উসকে দেয়। আর মানুষের মনের চাহিদাগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় চাহিদা যে, সে চিরদিন বেঁচে থাকতে চায়। তার জীবন শেষ হয়ে যাক, কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ তা কল্পনাও করতে পারেনা। এর সাথেই দ্বিতীয়

www.pathagar.com

চাহিদা তাকে পাগল পারা করে তোলে আর তা হচ্ছে ভুসম্পতি ও রাজশক্তির অধিকারী হওয়ার চাহিদা। শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দিলে চিরস্থায়ী জীবন ও বাদশাহীর উল্টো হতে পারে তা আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীর কল্পনাতেও আসেনি। এছাড়া শয়তানরূপী বন্ধুর কথামত চললে তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়ার পরিবর্তে উল্টো তা থেকে বহিস্কৃত হতে পারে তা তাদের ভাবনায়ও আসেনি। শয়তানের প্রতারনাপূর্ণ কথায়ও বশীভূতকরণ মন্ত্রে এবং তাদের প্রবৃত্তির চাহিদাকে উসকিয়ে দেয়ার ফলে আদম ও তার স্ত্রী ভুলে গেলেন যে সে তাদের দুশমন এবং যে চির দুশমন সে কখনও কোন ভাল কাজের উপদেশদাতা হতে পারেনা। তারা একথাও ভুলে গেলেন যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম তাদের বোধগম্য হোক বা না হোক তাদেরকে অবশ্যই সে নির্দেশ পালন করতে হবে। তারা আরও ভুলে গেলেন যে, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু সংঘটিত হতে পারেনা, চাই তা চিরস্থায়ী জীবন হোক কিংবা স্থায়ী সাম্রাজ্য হোক। এসব কথা ভুলে তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে গেলেন।

পৃথিবীতে বসবাসরত অন্যান্য মানুষ যারা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে অর্থ-বিত্ত, রাজ্য-রাজত্ব, ভোগ-বিলাস ইত্যাদির পানে পাগলের ন্যায় ছুটে চলছে তারাও বন্ধুরূপী শয়তানের ধোকা জালে আটকা পড়েই তা করছেন কিন্তু তারা তা বুঝতে পারছেনা। শয়তান এত চাতুর্যের সাথে তার ষড়যন্ত্র জাল বুনছে যে মানবীয় দুর্বলতার দোষে দুষ্ট মানুষ তা কোনভাবে বুঝতে পারছেনা। বরং অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তারা এগুলোকে আলিংগন করছে। একজন ঘুষখোর যখন ঘুষ খায় তখন সে এতে দোষের কিছু দেখেনা। সে মনে করে সে একজনের উপকার করছে তাই সে তাকে বিনিময়ে কিছু অর্থ প্রদান করছে। আবার দোষ মনে করলেও সে যুক্তি দাঁড় করায় যে, সে কাজটি না করলেও অন্য কেউ তা করে উক্ত সুবিধা হাতিয়ে নেবে। অতএব তার সে কাজ করতে সমস্যা কোথায়। আবার অন্যজন ভাবে ঘুষ না খেলে সংসারে টানাটানি চলবে। স্ত্রী-সন্তানদের চাহিদা মিটানো যাবেনা। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে সমাজে দুর্বল হয়ে বসবাস করতে হবে। ভালভাবে বাঁচার জন্য টাকা চাই। তাই ঘুষ গ্রহণে কোন দোষ নেই। এভাবে শয়তান অর্থলোলুপ মানুষের মনে তা আরও তীব্র করে তোলে, কিন্তু সে তা বুঝতে পারেনা। এভাবেই মানুষ অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, খুন-রাহাজানি, ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা ইত্যাদির দিকে এগিয়ে যায়। আর লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেকোন অন্যায় করতে দ্বিধা করেনা।

আল্লাহর ঘোষণা মতে শয়তানের পাতানো ফাঁদে তাঁর সৎ ও একনিষ্ট বান্দারা ধরা দেবেনা, আর শয়তানও তাদের কাবু করতে পারবেনা। এজন্য প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সেই আনুগত্য, যার চালিকাশক্তি হবে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের দুরন্ত এক আকাংখা, শয়তানের হাজারো বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা তার অনুসারী না হয়ে আল্লাহর সরল পথে ফিরে আসবে, তাঁর শোকরগুজার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে। আর এভাবেই মানুষ আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে হারানো জান্নাত ফিরে পেতে পারে।

www.pathagar.com

(ঞ) নিষিদ্ধ গাছের ফল কে আগে খেয়েছে-আদম না হাওয়া?

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ) এর সৃষ্টি কাহিনী সম্পর্কিত আলোচনা হতে আমরা জানতে পারছি যে, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পরিনতিতে আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ) কে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়ে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে। এ পর্যায়ে আমাদের সমাজে একটি বিতর্ক লক্ষণীয় আর তাহলো প্রথম কে এ ফল খেয়েছিল। শিশুকাল থেকে বিভিন্ন আলোচনা ও ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে এ সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি তাহলো মা হাওয়া শয়তান কতৃক প্ররোচিত হয়ে সর্ব প্রথম সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেন এবং তার প্ররোচনায় আদম (আঃ) পরে সেই ফল ভক্ষণ করেন। আর এজন্য নারী জাতিকে সমালোচনা ও তিরস্কারের লক্ষ্য বানানো হয়েছে। এ মতটি ইহুদি ও খৃষ্টানদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত কাহিনীর সাথে এ তথ্যের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। আমরা পবিত্র কোরআনে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া সম্পর্কে যে তথ্যের উল্লেখ পাই তাহলো -

"আমি এর আগে আদমকেও নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গেছে এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম ঃ তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। অতপর আমি বললাম হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। এখানে তুমি কখনো ক্ষুধার্ত হওনা-কখনো পোষাক বিহীনও হওনা। তুমি এখানে কখনো পিপাসার্ত হওনা-কখনো রোদেও কষ্ট পাওনা। অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, বললোঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেবো অনন্ত জীবন দায়িনী বৃক্ষের কথা এবং এমন রাজত্বের কথা-যার কখনো পতন হবেনা। অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল খেলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বিভিন্ন গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে লাগলো। আদম তার পালন কর্তার অবাধ্যতা করলো, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন।" (ত্বাহাঃ ১১৫-১২২)

আলকোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহের কোথাও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আদম (আঃ) এর স্ত্রীকে সম্বোধন করা হয়নি। এখানে প্রতিটি বিষয়ে হযরত আদম (আঃ) কে সম্বোধন করা হয়েছে। ১১৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে আদম (আঃ) দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। ১১৭ নং আয়াতে তাকে সম্বোধন করে তারও তার স্ত্রীর প্রকাশ্য দৃশমন শয়তান সম্পর্কে তাদের সাবধান করা হয়েছে এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। জান্নাতে তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পোষাকে কষ্ট পাবে না, এটাও তাকে জানানো হয়েছে। শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়েছে তা-ও আদম (আঃ) কে। কিন্তু নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছে

www.pathagar.com

তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এবং লজ্জাস্থান খুলে গেছে তাদের উভয়ের। আল্লাহর নাফরমানী করা, পথভ্রষ্ট হওয়া, নবুয়াতের জন্য মনোনীত করা, তাওবা কবুল করা এবং সঠিক পথের নির্দেশনা প্রদান, সকল ক্ষেত্রেই আদম (আঃ) এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরও কি বলা যাবে যে, মা হাওয়া নিজে প্রতারিত হয়ে হযরত আদম (আঃ) কে প্রলোভন দিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে বাধ্য করেছেন। বরং কোরআনের এসব আয়াত হতে জানা যায় উভয়েই ফল খেয়েছেন তবে এক্ষেত্রে আদম (আঃ) এর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এখন সুরা আল আরাফের নিচের আয়াতগুলো পড়ুন।

"অতঃপর শয়তান তাদের দুজনকেই কুমন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের অঙ্গ যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে তাদের বললো, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ গাছ থেকে নিষেধ করেননি, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও- কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেললো। অনন্তর তারা বৃক্ষ আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগলো। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।" (আল-আরাফ ঃ ২০-২৩)

এখানে কুমন্ত্রণা দান থেকে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাসহ সকল ক্ষেত্রে আদম (আঃ) এবং তার স্ত্রীকে একত্রে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য এককভাবে কাউকে দায়ী করা হয়নি এবং কাউকে দোষারোপও করা হয়নি। অতএব এজন্যই মা হাওয়াকে একক দায়ী করা আদৌ যুক্তিসংগত নয় এবং সঠিকও নয়।

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়ুন ঃ

"এবং আমি আদমকে আদেশ করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করতে থাকো এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়োনা। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদসখলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও।"

এখানেও আদম (আঃ) ও মা হাওয়ার যৌথ অবাধ্যতা ও পদসখলনের কথা বলা হয়েছে। এককভাবে কাউকে দোষারোপ করা হয়নি। তাই ইহুদি ও খৃষ্টানদের ন্যায় নারী জাতির প্রতি যে কোন ধরণের কুধারণা থেকে বিরত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

(ট) গুনাহ ও তওবা

আদম (আঃ) এর সৃষ্টি কাহিনীতে গুনাহ ও তওবা সম্পর্কে ইসলামের চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ ও তওবা দুটোই একান্তভাবে ব্যক্তিগত দায় দায়িত্বের ব্যাপার। এতে কোন বক্রতা ও জটিলতা নেই। এটি খুবই সহজ ও সুস্পষ্ট বিষয়। একের পাপের জন্য অন্যকে প্রশ্নও করা হবেনা এবং শাস্তিও দেয়া হবেনা। কিন্তু এক্ষেত্রে খৃষ্টবাদের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ বিপরীত। এ মতবাদের দৃষ্টিতে, মানুষের জন্মের আগে থেকেই তার ঘাড়ে পাপ চেপে বসে আছে। খৃষ্টবাদের একথাও সত্য নয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) হযরত আদমের (আঃ) পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেই শূলে চড়েছেন এবং তার পাপ থেকে তার সন্তানদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তাদের বক্তব্যের কোন ভিত্তি নাই। এটি একেবারেই বাজে কথা। আদম (আঃ) এর গুনাহ তাঁর ব্যক্তিগত গুনাহ ছিল। তিনি সরাসরি তওবা করে নিজেই তা থেকে মুক্ত হয়েছেন। আর এ মুক্তি ছিল একেবারেই সোজা ও সরল পথে। আদম সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের পাপ তার নিজস্ব পাপ। প্রত্যেকের জন্য সহজ ও সরল উপায়ে তওবার পথ খোলা রয়েছে।

অতএব, গুনাহ ও তওবার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত মতবাদই সুস্পষ্ট ও সরল সান্তনাদায়ক মতাদর্শ। এ মতাদর্শের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ নিজের পাপের জন্য নিজেই দায়ী, কিন্তু সে জন্য তার হতাশ হবার কোন কারণ নেই। চেষ্টা সাধনা দ্বারা সে কৃত পাপ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। মানুষ ভুল করে যখনই তওবা করে, তখনই সে তওবার দুয়ার তার সামনে খোলা দেখতে পায় এবং আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করেন এবং পিছনে যাওয়া পা-কে যথাস্থানে স্থাপন করেন। আর এভাবেই মানুষ ভুল করেও আল্লাহ তায়ালার রহমত সিক্ত হয়ে মুক্তির সাধ আস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

মানব বংশ বিস্তার

আদম (আঃ) ও মা হাওয়ার জান্নাত হতে পৃথিবী নামক বাসস্থানে আগমনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা ঘটে। এখানে তাদের বংশ বিস্তার ঘটে। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে জন্ম-মৃত্যুর পালা বদলের খেলায় বর্তমান পৃথিবীতে পাঁচশত কোটির অধিক আদম সন্তান বসবাসরত। দিনে দিনে তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

এ পর্যায়ে আমরা মানুষের বংশ বিস্তার সম্পর্কে কোর আনের বক্তব্য জানতে সচেষ্ট হবো। মানব বংশের প্রথম সদস্য আদম (আঃ)। তাকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর মাটি থেকে তৈরী করেছেন এবং তার দেহে নিজ রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার ফলে তা জীবন্ত মানুষে রূপ লাভ করে। তার থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন তার জীবন সংগিনী হাওয়া (আঃ) কে। তাদের উভয়ের মিলনে মানব জাতির বংশ ধারা বিস্তারের এক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কয়েম করেন মহান আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আলকোরআনে আল্লাহর বাণীঃ

"হে মানব সমাজ তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগনিত পুরুষ ও নারী।" (আন্-নিসা ঃ ১)

"হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আল-হুজুরাত ঃ ১৩)

"তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন।" (আল- যুমার ঃ ৬)

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিলনা? অতঃপর সে ছিল রক্তপিন্ড। অতপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল-নর ও নারী।" (আল-কেয়ামাহ ঃ ৩৬-৩৯)

"তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন হবে এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ! আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (আররূম ঃ ২০-২১)

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে মানব বংশের বিস্তার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও সত্য আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। এগুলি হলো -

(১) আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানুষ তৈরী করেছেন মাটি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। এরপর থেকে আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানুষের জোড়া হতে অর্থাৎ তাদের মিলনের মাধ্যমে জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ নর ও নারী হিসেবে মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি সে ধারা অব্যাহত আছে। শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই এজোড়া সৃষ্টির ধারা প্রযোজ্য নয়, বরং আল্লাহর সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রেই জোড়া জোড়ার এ পদ্ধতি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কোরআনের বাণী ঃ

"তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন।" (আশ -শুরা ঃ ১১)

"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন কর।" (আয-যারিয়াত-৪৯)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় শুধুমাত্র মানুষ নয়, বরং আল্লাহর সকল সৃষ্টি এমনকি জড় পদার্থও আল্লাহ তায়ালা জোড়ার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানব জাতিকে প্রকৃত সত্যের দিকেই পরিচালিত করছে। আর তাহলো গোটা বিশ্বজগত সৃষ্টির মূল হলো পরমানু। আর এই পরমানু বিদ্যুতের একটি জোড়া দিয়ে তৈরী ঃ নেগেটিভ ও পজেটিভ। আমরা যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করছি সেখানেও দুটি দিক রয়েছে- পজেটিভ ও নেগেটিভ এবং দুয়ের মিলন হলেই আমরা বিদ্যুৎ শক্তি থেকে উপকার পেয়ে দিয়ে থাকি।

(২) আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষের বীর্য হতে নতুন মানুষ সৃষ্টি করে থাকেন। আল্লাহ তাদের মধ্যে যৌন কামনা ও বাসনা সুপ্ত রেখেছেন। তাদের এ সুপ্ত কামনা জেগে উঠলে তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। ফলে তাদের বীর্যপাত ঘটে এবং এ বীর্য নারীর গর্ভাশয়ে স্থায়ী হয়ে আল্লাহর কুদরতে নারী কিংবা পুরুষ মানব সন্তানের রূপলাভ করে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পূর্ণাংগ মানব শিশু হিসেবে আলো ঝলমল পৃথিবীতে আগমন করে। এ পর্যায়ে কোরআনের বাণী ঃ

"এবং তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, এক বিন্দু বীর্য থেকে যখন স্খলিত করা হয়।" (আন্-নজম ঃ ৪৫-৪৬)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"মানুষের ওপর কি মহাকালের এমন একটা সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য জিনিসই ছিলনা? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত বীর্য থেকে, যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। অতঃপর তাকে শ্রবনশক্তি সম্পন্ন বানিয়েছি।" (আদ্‌দাহর ঃ ১-২)

www.pathagar.com

এখানে 'আমশাজ' অর্থাৎ মিশ্রিত বীর্য হতে মানুষ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি, যে বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়, তা জরায়ুতে প্রবিষ্ট বীর্যের পুরুষ কোষ ও নারী ডিম্বানুর মিশ্রনের পরেই তৈরী হয়। এ দ্বারা বীর্যের মধ্যে নিহিত পরবর্তী প্রজন্ম ও উত্তরাধিকারের বিষয়টিও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এর অপর নাম 'জিন'। আমাদের চারপাশে বিদ্যমান গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি জীব জানোয়ারের প্রজননও একই পদ্ধতিতে ঘটে থাকে।

(৩) আমরা জানতে পারলাম যে, বিপরীত লিংগের মিলনের ফলশ্রুতিতে নির্গত বীর্য থেকে মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তুর বংশধারা সৃষ্টি হয়। অন্যান্য জন্তুর ক্ষেত্রে বীর্যপাত ও উক্ত বীর্য নারীর গর্ভাশয়ে ধারণের মাধ্যমেই তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। তাদের এ সম্পর্কটা সাময়িক। এ সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা এবং স্নেহ-মমতার স্থান অতি নগন্য। কিন্তু মানুষের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নর-নারীর পারস্পরিক মিলনে মানব সন্তানের জন্মদান একটি উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পর তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের ভেতর থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো। অধিকন্তু তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসাও পারস্পরিক সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

বিপরীত লিংগের প্রতি মানুষের তীব্র আবেগ বিদ্যমান। আর এ আবেগ তাদের অনুভূতি শক্তিকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়ার কারণে তারা নানা প্রকার তৎপরতায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টির এটাই শেষ কথা নয়। আল্লাহ তাদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্ত্বা নয়, তাদেরকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদের হৃদয়ে আবেগ ও অনুভূতি সঞ্চিত রেখেছেন এবং উভয়ের মধ্যকার এই সম্পর্কের মধ্যে উভয়ের প্রবৃত্তি ও স্নায়ুতন্ত্রীর পরিতৃপ্তি, দেহ ও মনের শান্তি, জীবন ও জীবিকার স্থিতি, আত্মা ও অন্তরের সম্প্রীতি এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রশান্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন। আমরা চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কত দয়াবান। একজন পুরুষ মানুষ একা। এ এক অর্থহীন জীবন। আবার শুধুমাত্র নারী, একই রকম অর্থহীন জীবন। আল্লাহ অত্যন্ত মেহেরবানী করে উভয়ের জন্য তাদের জোড়া সৃষ্টি করলেন। তাদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়, পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে তৈরী করেছেন। তাদের একজনকে অন্যজনের মানসিক, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন পূরণকারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এতে মানুষ শান্তি, স্থিতি ও তৃপ্তি লাভ করবে। বিশেষ করে নারী পুরুষ তাদের মিলনের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে লাভ করে অনাবিল সুখ, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। আর উভয়ে হয়ে দাঁড়ায় উভয়ের পরিপূরক। কারণ, উভয়ের দৈহিক ও মানসিক গঠন এমন যে, একজনের ভেতর

www.pathagar.com

রয়েছে অপরজনের কামনা ও বাসনা চরিতার্থ করার ব্যবস্থা। উভয়ের উষ্ণ আলিঙ্গনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আগমন ঘটে নতুন প্রজন্মের। আর প্রশান্তি ও মানসিক পরিতৃপ্তির ফলেই নবজাত শিশুর আগমনকে আনন্দঘন ও সুখকর করার জন্য তাদের জন্মদাতাদের কি প্রানান্ত আয়োজন।

(৪) মানব জীবনের ভিত্তি হলো পরিবার। আল্লাহ তায়ালা মানুষের পৃথিবীর জীবন শুরু করার পরিকল্পনা করলেন পরিবারের এ চারাগাছের মাধ্যমে। তাই প্রথমে তিনি এক প্রাণ সৃষ্টি করলেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করলেন তার স্ত্রী বা সংগিনী। অতঃপর গঠিত হলো স্বামী-স্ত্রীর এক পরিবার। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয় থেকে বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করলেন। সৃষ্টি হলো নরনারীর অসংখ্য জোড়া। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে শুরুতেই অগনিত নারী-পুরুষ ও তাদের জোড়া সৃষ্টি করতে পারতেন। তার দ্বারা অসংখ্য পরিবার সৃষ্টি হয়ে যেত। এভাবে মানুষের বংশ বিস্তার ঘটতো, কিন্তু তাদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরী হতো না। তাদের সম্পর্ক হতো পশু সমাজের ন্যায়। যেমনটা ইদানিং জড়বাদী সমাজে লক্ষ্যনীয়।

অবশ্য মহান আল্লাহ তায়ালা এ বন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইলেন, তাই তিনি প্রভুত্বের বন্ধন থেকে শুরু করলেন যা হলো সকল বন্ধনের সূচনা বিন্দু ও প্রথম বন্ধন। একেতো প্রভুত্বের বন্ধন, তার সংগে যোগ করলেন আত্মীয়তার সম্পর্ক। সুতরাং এক নর ও এক নারীর প্রথম পরিবার গঠিত হলো, যারা এক প্রাণ, এক স্বভাব এবং এক সৃষ্টি থেকে আসলো। অতএব আল্লাহ তায়ালা প্রথম পরিবার থেকে অগনিত নারী-পুরুষ এ পৃথিবীতে বিস্তার করেন। সকলেই প্রথমে প্রভুত্বের বন্ধন, তারপর পরিবারের বন্ধনের দিকে ফিরে আসে। ধাপে ধাপে এ পরিবার থেকেই অদ্যাবধি মানব বংশধারার বিস্তার ঘটেছে। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাদের জীবন ও সমাজে নানা সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। মানুষের জীবনে আসে অনেক বিচ্যুতি। তাদের অনেকেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টিকালীন ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে পশু সমাজের নিয়ম গ্রহণ করে। তারা পশুদের ন্যায় যৌন লালসা চরিতার্থ করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মিলনে সন্তান তৈরী হলে তার দায়িত্ব গ্রহণেও অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। আবার কেউ কেউ সমলিংগে যৌনতা চরিতার্থ করার পথ বেছে নেয়। এভাবে তারা মানব বংশ বিস্তারে তাদের দায়িত্বের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় এবং পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত হয়।

পৃথিবীর সকল ধর্মের বিধান মতে নারী-পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গড়ে উঠে। তাদের দৈহিক মিলনের ফলে সন্তান-সৃষ্টির মাধ্যমে উক্ত পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে সকল নরনারী মানব বংশের বিস্তারে নিজ নিজ অবদান রাখে। সকল ধর্মেই বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন নিষিদ্ধ এবং এহেন অবৈধ মিলনের ফলে সৃষ্ট সন্তান সমাজের স্বীকৃতি লাভ করে না। সমাজ তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান বিবাহের মাধ্যমে নরনারীর পরিবার গঠন ও যৌন জীবন নতুন কোন ব্যবস্থা নয়। এটি একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। ইসলামে এ ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বাইরে যে কোন ধরণের যৌন সম্পর্ক শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

ইসলামী বিধান অনুসারে আল্লাহর প্রভুত্ব ও মাতা পিতার প্রতি সদাচরণের ভিত্তিতে মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট পরিবার গড়ে উঠে। আল্লাহ তায়ালা এ সমাজ গঠন প্রসঙ্গে নির্দেশ দেন ঃ

"তোমার পালন কর্তা আদেশ করছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করোনা এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (বনি ইসরাইল ঃ ২৩)

(৫) আমরা জানতে পারলাম যে, প্রথম মানুষ আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীর পৃথিবীতে আগমনের পর হতে যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে তারা সকলেই নরনারীর বীর্য হতে সৃষ্টি হয়েছে। এ বীর্যটা কি? বীর্য হলো পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে স্খলিত নাপাক পানি। অতএব বলা যায় মানুষ সৃষ্টির উপাদান হলো পানি। ইদানিং বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্তু পানি হতে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আলকোরআনে বিজ্ঞানীদের নব আবিস্কৃত এ তত্ত্বের ঘোষণা দান করে বলেছেন, জগতের সকল প্রাণকে পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"আমি প্রাণবান সবকিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আল আম্বিয়া ঃ ৩০)

"আল্লাহ তায়ালা বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই পানি থেকে পয়দা করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু চলে তার বুকের ওপর ভর দিয়ে, কিছু চলে দু'পায়ের ওপর, আবার কিছু চলে চার পায়ের উপর ভর করে।" (আন্ নূর ঃ ৪৫)

কিন্তু আমরা জানি প্রথম মানুষকে আল্লাহ মাটি দ্বারা তৈরী করেছেন, আর তার থেকেই তাঁর স্ত্রী এবং তাদের মিলনেই অবশিষ্ট মানব জাতির উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে জেনে নেয়া দরকার যে, মানুষ এ পৃথিবীর মাটি অর্থাৎ মাটিজাত উপাদান থেকে তৈরী। পৃথিবীতে আগমনের পর হতে এ মাটির উৎপাদিত ফল-ফসল এবং মাটিতে বিচরণরত পশু-পাখীর গোশ্ত খেয়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের দেহ গঠন ও সংরক্ষণ করে। আর এসব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে মাটি ও পানির যৌথ অবদান। পানি নেইতো জীবন নেই। মাটি থেকে উৎপন্ন এসব দ্রব্যাদি থেকে মানব দেহে যে সার নির্যাস তৈরী হয়, তাই বীর্য। মানব দেহের ৭০ ভাগ পানি, আর বীর্যও পানির সমাহার। যেহেতু স্খলিত হয়ে তা নারীর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করবে, তাই সেগুলোর তরল অর্থাৎ পানির আকৃতি হওয়াই বিজ্ঞান সম্মত।

(৬) মানব বংশ বিস্তার প্রসঙ্গে আমরা অন্য একটি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়ে থাকি তাহলো মানব সৃষ্টি ধারায় নরনারীর অবদান সমভাবে প্রযোজ্য। পুরুষের শুক্রানু ও নারীর ডিম্বানুর মিলনের স্বাভাবিক পরিনতি হলো মানব শিশুর জন্মলাভ। এক্ষেত্রে কোন একজনের ভূমিকার কোন কার্যকারিতা নেই। শিশুর ধমনীতে উভয়ের রক্তধারা প্রবাহিত। সে মা-বাবা উভয়েরই উত্তরাধিকার বহন করে। এক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় হলো, উভয়ের শুক্রানু ও ডিম্বানুর মিলনে কখনো নারী শিশু আবার কখনো পুরুষ শিশু জন্ম লাভ করে। তারা একে অপরের সহোদর। অতএব তারা সমমর্যাদার অধিকারী। এদিক থেকে নারীর চেয়ে পুরুষ অধিক মর্যাদা সম্পন্ন এবং নারী পুরুষের চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী এটা অদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর

আমরা আলকোরআন অধ্যয়নে জানতে পেরেছি যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মাটি থেকে জগতের প্রথম মানুষ আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তিনি নিজ রূহ থেকে কিছু অংশ ফুঁকে দেন। তাকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। পরে আদম (আঃ) থেকে আল্লাহ তার সংগিনী মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। তাদেরকে সৃষ্টি করেন নরনারীর জোড়া রূপে। পরবর্তীতে মিলনের মাধ্যমে মাটির নির্যাস দ্বারা মানব বংশধারা বিস্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মাটির নির্যাস হলো নরনারীর দৈহিক মিলনের ফলে তাদের দেহ থেকে স্খলিত শুক্রবিন্দু। এ শুক্র বিন্দু নারীর জরায়ুর সূক্ষ্মতম স্থানে অবস্থান করে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আল্লাহর রহমতে একটি সুন্দর সুগঠিত নারী কিংবা পুরুষ শিশু হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করে।

মহাগ্রন্থ আলকোরআন মানুষের সৃষ্টির এ প্রক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ধারনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। কোরআনের এ সম্পর্কিত বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক জ্ঞান গবেষণার পর কোরআন উপস্থাপিত তত্ত্বেরই সত্যায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে আমরা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর মানব সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝতে সচেষ্ট হবো। এ পর্যায়ে আলকোরআনের বাণী ঃ

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর এই শুক্রবিন্দুকে আমি এক ফোটা জমাট রক্তে পরিনত করেছি , অতপর জমাট রক্তকে পিন্ডে পরিনত করেছি, কিছুদিন পর এই পিন্ডকে পরিনত করেছি অস্থি পাজরে, তারপর এক স ময় এই অস্থি পাজরকে কিছু গোস্তের পোষাক পরিয়ে দেই, অতপর তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সৃষ্টি তথা মানুষ রূপে দাঁড় করিয়েছি। (ভেবে দেখো) আল্লাহ তায়ালা কতো সুনিপুন সৃষ্টিকর্তা, কতো মহান তাঁর সৃষ্টি।" (আল মুমেনুন ঃ ১২-১৪)

"হে লোক সকল, যদি পুনরুত্থানের ব্যাপারে তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (ভেবে দেখো) আমি তোমাদের প্রথমত মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর শুক্র থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে, যেন তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কিত কথাগুলো) আমি প্রকাশ করে দিতে পারি। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি, অতপর তোমরা (এক সময়) তোমাদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো। তোমাদের মধ্যে কেউ (বয়প্রাপ্তির আগেই) মরে যায় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষকর্মা বয়স পর্যন্ত

www.pathagar.com

পৌঁছানো হয়। যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না।" (আল হাজ্জ ঃ ৫)

"তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, অতপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারো কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন করো। " (আল মুমিনুন ঃ ৬৭)

"তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। (আল- যুমার ঃ ৬)

"মানুষ যেন একবার দেখে নেয় যে, তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা প্রবাহিত হয় মানুষের পিঠের মেরুদন্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখান থেকে। " (আত তারিক ঃ ৫-৭)

উপরের আয়াতগুলো তেলাওয়াতে আমরা জানতে পারলাম যে, মাতৃগর্ভে যে মানব শিশু জন্মলাভ করে সেটি সাতটি ধাপ অতিক্রম করে পৃথিবীর আলো বাতাসে আগমন করে। মানব সৃষ্টির এ স্তরগুলো হলো ঃ

(১) মাটির সারাংশ
(২) বীর্য বা শুক্রবিন্দু
(৩) জমাট রক্ত
(৪) মাংসপিন্ড
(৫) অস্থি পাজর
(৬) অস্থি পাজরকে মাংসের পোষাক দ্বারা আবৃতকরণ
(৭) সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চার করণ।

মায়ের দেহে মানব সৃষ্টির এ জটিলতম কাজটি চলছে সবার অলক্ষে অগোচরে তিনটি আবরণের মধ্যে। এ আবরণগুলো হলো মায়ের পেট, রেহেম ও জরায়ুর ফুল বা গর্ভাধার। এসবই মহান স্থপতি মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রতিফলন।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আহবান জানিয়েছেন মানুষের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে। আল্লাহর আহবানে সাড়া দেয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আর যারা বিশ্বাসী তারা কোনভাবে তাঁর আহবানে সাড়া না দিয়ে পারেনা, এটা তাদের ঈমানের দাবী। তাই মহান কুশলী আল্লাহ তায়ালা মাতৃদেহের ক্ষুদ্র কারখানায় কিভাবে ধাপে ধাপে মানুষের ন্যায় সবচেয়ে জটিল ও কঠিন সৃষ্টিকে বাস্তব রূপ দান করেন তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

ইতোপূর্বেকার আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান হলো কাদা মাটির নির্যাস। এই নির্যাস দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন। এরপর মানব সন্তানদের আগমন ধারা শুরু হলো এবং তাদের বংশ বৃদ্ধির কাজ চলতে থাকলো মহান আল্লাহ নির্ধারিত প্রক্রিয়ায়, মানুষের শুক্রবিন্দু বা বীর্য থেকে যা মানুষ খাদ্যের রূপে মাটিজাত দ্রব্যাদি থেকে গ্রহণ করে থাকে। কোরআনের অন্যত্র এ শুক্রবিন্দুকে বলা হয়েছে আমশাজ বা মিশ্রিত বীর্য। এটি এক ধরণের তরল পদার্থ। এ পানি পুরুষের মেরুদন্ড ও নারীর বক্ষ পাজরে অবস্থান করে। নরনারীর দৈহিক মিলনে তা নির্গত হয়ে 'আমশাজ' এ রূপ লাভ করে। এ পর্যায়ে কোরআনের বাণী ঃ 'তাকে বানানো হয়েছে সবেগে সখলিত পানি থেকে, যা প্রবাহিত হয় মানুষের পিঠের মেরুদন্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখান দিয়ে।' এ তত্ত্বটি গোপন ছিল। মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতো না। মাত্র বিগত শতাব্দীতে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ে অবগত হয়। মানুষ জানতে পারে পুরুষের বীর্য তার মেরুদন্ডে এবং নারীর বীর্য তার বুকের উপরের হাড়ের ভেতরে তৈরী হয়। অতপর নারীর বাচ্চাদানিতে মিলিত হয়। এটি একটি সুরক্ষিত স্থান , অর্থাৎ জরায়ুর দুই পাশের অস্থি দুটির মধ্যবর্তী কোটরগত স্থানের গভীরে, যে স্থানটি শরীরের ঝাঁকির ক্ষতি থেকে রেহাই পায়, রেহাই পায় সকল প্রকার আঘাত ও ক্ষত থেকে এবং সকল প্রকার কম্পন ও ধাককা থেকে। এখানেই মানুষের সৃষ্টি খেলা চলতে থাকে।

এখন জানা যাক বীর্য জিনিসটা কি? ওটা তো পুরুষের তরল বীজ। এই তরল বীজের একটি ফোঁটায় হাজার হাজার শুক্রকীট থাকে। এর মধ্যে থেকে কোন একটি মাত্র কীটের সাথে নারীর জরায়ুতে অবস্থানরত ডিম্বানুর মিলন ঘটে এবং এই সংযুক্ত উপাদান বা বীজটা যুক্ত হয়।

জরায়ুর দেয়ালের সাথে যুক্ত এই অতি ক্ষুদ্র সংযুক্ত বীজটাই মহান আল্লাহর অসীম শক্তি বলে ভবিষ্যতের মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এসব বৈশিষ্ট্য হতে পারে দৈহিক যেমন- লম্বা বা বেঁটে হওয়া, সরু বা মোটা হওয়া। আবার সেগুলো হতে পারে ভাবাবেগ জনিত যেমন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, স্বভাব ও দৃষ্টিভংগি, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি।

আলকোরআন থেকে আমরা জানতে পারি এক্ষুদ্র কীটটি মানুষের অস্তিত্বের মধ্য হতে অন্য একটি অস্তিত্বের জন্য বানানো হয়েছে। সে আকাংখিত অস্তিত্বে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত কেউ কি ভাবতে পারে বা বিশ্বাস করতে পারে যে, এতসব গুনবৈশিষ্ট্য সে ক্ষুদ্র বিন্দুটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে? কে কল্পনা করতে পারে যে, সে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিন্দুটাই আজকের এই বহুমুখী বৈশিষ্ট্য ধারী মানুষ। যার প্রতিজন অপরজন থেকে ভিন্ন। পৃথিবীতে কোন দুজন মানুষও কি কোন কালে একই রকম হয়েছে?

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পুরুষের বীর্য হতে নারীর জরায়ুতে প্রবিষ্ট একটি মাত্র শুক্রকীট মাতৃ ডিম কোষের সাথে মিলিত হয়ে রক্ত পিন্ডতে পরিনত হয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে বাচ্চাদানীর গায়ের সাথে একটি ক্ষুদ্র বিন্দু আকারে

www.pathagar.com

লেগে থাকে এবং মায়ের শরীর থেকে রক্ত আকারে তার খাদ্য পেতে থাকে। পরে এ জমাট রক্ত মাংস পিন্ডে পরিনত হয়। প্রথমে জমাট রক্তের টুকরোর কোন রূপও থাকে না, আকৃতিও থাকে না। কিন্তু ভেতরে চলতে থাকে সৃজন প্রক্রিয়া। এক পর্যায়ে তা একটা মাংস পরিবেষ্টিত হাড্ডিতে রূপান্তরিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। আর যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে এটির পূর্ণাংগ মানবাকৃতি না হওয়ার, তাহলে তা সুনির্দিষ্ট রূপ বা আকৃতি লাভের আগেই জরায়ু তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আল্লাহর কুদরতে সৃষ্ট হাড্ডি ও মাংসের পিন্ডটি পূর্ণাংগ মানুষে পরিনত হওয়ার আগ পর্যন্ত কিছুকাল মাতৃ জরায়ুতে অবস্থান করতে থাকে। আল্লাহর ঘোষণা, 'আর আমি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে যা ইচ্ছা করি স্থিত রাখি।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যে মানব শিশুকে পূর্ণ পরিনত করতে ইচ্ছা করেন, তাকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় না আসা পর্যন্ত জরায়ুতেই রাখেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা হাড্ডি ও মাংস পিন্ডকে নতুন এক সৃষ্টি অর্থাৎ শিশুর আকৃতিতে পৃথিবীর খোলা উদ্যানে নিয়ে আসেন। আল্লাহর ঘোষণা, 'অতপর তোমাদেরকে শিশুর আকারে বের করি।'

মাতৃগর্ভের মানুষ সৃষ্টির প্রথম স্তর ও শেষ স্তরের মাঝে কী বিরাট ব্যবধান। সময়ের দিকে এ ব্যবধান সাধারণত নয়মাস ব্যাপী হয়ে থাকে। সুরা আলা-আহক্বাফ-এর আয়াতঃ ওয়া হামাল্লাহু ওয়া ফাছালাহু ছালাসুনা শাহরান। (তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস) অনুসারে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সময়কালও কোরআনের বর্ণনার সাথে সংগতিপূর্ণ।

আমরা শুক্রকীট থেকে মানব শিশুর জন্ম যাত্রার ব্যবধানের সময়কালের সংগে তুলনা করলে দেখতে পাবো, শুক্রকীটের প্রকৃতি ও শিশুর প্রকৃতির পার্থক্যের দিক দিয়ে এই ব্যবধান অনেক বেশী। শুক্রকীটকে খালি চোখে দেখাই যায়না। অথচ সেটাই একটা বহুমুখী দোষগুন বিশিষ্ট, নানা অংগ প্রত্যংগ সমন্বিত, বিচিত্র লক্ষণ ও আলামতের ধারক। বিবিধ যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী এবং বিভিন্ন স্বভাব ও মনোভাব সম্পন্ন জ্বলজ্যান্ত মানুষের রূপ ধারণ করে।

এই দুই অবস্থার মাঝে যে ব্যবধান, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ মাত্রকেই আল্লাহ তায়ালার শক্তিশালী নিদর্শনাবলীর সামনে থমকে দাঁড়াতে হয়। অজান্তেই কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত হয়ে আসে তার মাথা।

নানা অলৌকিক স্তর অতিক্রম করে মানব শিশু চোখের অগোচরে বিদ্যমান অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে আগমনের পর মানব শিশুকে ক্রমান্বয়ে আরও নানাস্তর অতিক্রম করতে হয়। এ পর্যায়ে আল্লাহর ঘোষণা ঃ 'অতপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। আর তোমাদের মধ্যে কতক এমন আছে,

www.pathagar.com

যারা মারা যায়, আর তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাদেরকে অকর্মন্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, ফলে জানা কথাও সে মনে রাখতে পারে না।'

এখানে 'তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর'- এ কথার মাধ্যমে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও অগ্রগতি লাভের কথা বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, একটি সদ্যজাত শিশু ও একজন পরিনত বয়সের মানুষের মাঝে সময় বা বয়সের ব্যবধান যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে গুনগত ব্যবধান। যে মহাশক্তিধর স্রষ্টার সুদক্ষ কারিগরী হাত সদ্য প্রসূত শিশুর মধ্যে পরিনত মানুষের যাবতীয় গুনপনা ও যোগ্যতা প্রতিভার সমাবেশ ঘটান, সেই উদ্ভাবনী হাতই সে ব্যবধান অনায়াসে অতিক্রম করে। কারণ এই কুশলী হাতই ইতিপূর্বে জরায়ুর প্রাচীরে সংরক্ষিত তুচ্ছ পানির বিন্দুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন মানব শিশুর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তায়ালা মাটির নির্যাসকে শুক্রবিন্দতে এবং সে শুক্র বিন্দুকে মায়ের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে তাকে আলাক বা জমাটবদ্ধ রক্তে পরিনত করে বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মাটির এ রূপান্তর নির্দেশ করছে মানুষের মেধা ও যোগ্যতা কোন এক দিক বা বিভাগে সীমাবদ্ধ নয়। সে তার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতাকে গঠন মূলক ও ধ্বংসাত্মক উভয় প্রকার কাজে ব্যবহার করে তার কল্যানে নিবেদিত পৃথিবীর বস্তুনিচয় নানা আংগিকে কাজে লাগাতে পারে। মানুষের বহুমুখী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের দিকে তাকালে আমরা এসত্যের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। মানুষ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 'কুন' বা হও এ একটি শব্দের উচ্চারনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং ধাপে ধাপে এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মাধ্যমে আল্লাহ নগন্য মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। এ সূক্ষ্ম ও জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণের পেছনে আল্লাহ তায়ালার মহৎ ইচ্ছা কাজ করেছে। আল্লাহর খলীফা মানুষকে এ পৃথিবীতে অনেক জটিল ও অসাধ্য সাধন করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল ও কঠিন আবিষ্কার সমূহ তার জ্বলজ্যান্ত প্রমান। এছাড়া মানুষের দেহসত্তা যেসব কারিগরী ব্যবস্থা নিয়ে গড়ে উঠেছে তার সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমবিকাশের কলাকৌশল মানুষের অবগত হওয়া দরকার। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মানুষ সৃষ্টি হলে, এনিয়ে হয়তো তেমন ভাবা হতোনা। আবার কোন কারখানার ডাইসে তৈরী হলেও এনিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হতোনা। প্রকৃত অবস্থা যাই হোকনা কেন মানুষের নিজের প্রয়োজনেই তার সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার। আর অবগত হওয়ার দরকার মানুষের মহান স্রষ্টা সম্পর্কে, যার অনুগ্রহে অনস্তিত্ব থেকে মানুষ অনিশ্চিত পথ পাড়ি দিয়ে বাস্তবতার মুখ দেখেছে। আর এজন্যেই মহাগ্রন্থ আলকোরআনের প্রথম বাণী ঃ "হে নবী, তুমি পড়ো, পড়ো তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা একদলা রক্ত থেকে। তুমি পড়ো, তোমার প্রতিপালক তোমার উপর বড়ই মেহেরবান। তিনি কলমের সাহায্যে যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন সব কিছুর জ্ঞান যা সে জানতোনা।"

আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহর (সাঃ) উপর অবতীর্ণ প্রথম ওহীতে মানুষের সৃষ্টি উপাদান অর্থাৎ জীব বিজ্ঞান ও শরীর বিদ্যার নানা দিক নিয়ে চিন্তা গবেষণার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এদেহ সত্তার স্রষ্টা সম্পর্কে অবগত হতে বলেছেন। আর এজন্য পড়ার পাশাপাশি লেখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোরআনের এ ঘোষণার বাস্তবায়ন করে আজকের আধুনিক বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আকাশচুম্বী সাফল্য লাভ করেছে। অথচ কোরআনের মালিক মুসলমানগন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ তাদের মুখাপেক্ষী। অতএব দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নতি ও মুক্তির জন্য জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। এজ্ঞানই মানুষকে ফেরেশতার মোকাবেলায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। আর এ জ্ঞানের হাতিয়ার ব্যবহার করেই বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হওয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

মানুষের দৈহিক গঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ

আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত ভারসাম্যপূর্ণ সৃষ্টি। তিনি মানুষকে অতি সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টির পাশাপাশি যেখানে যে অংগ-প্রত্যংগ স্থাপন করা দরকার সেখানে তা স্থাপন করেছেন। চোখের জায়গায় নাক কিংবা নাকের জায়গায় কান স্থাপন করেননি। প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগকে অত্যন্ত নিখুত পরিকল্পনা মাফিক মহাকুশলী আল্লাহ তৈরী করেছেন এবং সেগুলিকে মানবদেহে সংযুক্ত করেছেন। এমনকি যার জন্যে যে কাজ প্রযোজ্য তাকে সে কাজের শক্তি ক্ষমতা প্রদান করেছেন। দেহের সকল অংগ-প্রত্যংগ পারস্পরিক সহযোগিতা মূলকভাবে কাজ করে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ কিংবা অসহযোগিতার কোন আশংকা নেই।

ভারসাম্যপূর্ণ দেহের পাশাপাশি মানুষকে মহান আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান-বুদ্ধির ভারসাম্যও দান করেছেন। তিনি মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান করেছেন। তাকে সৃষ্টিগতভাবে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের অনুভূতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত এসব গুনাবলীর কারণেই মানুষ হলো মানুষ। সৃষ্টির সেরা জীব। জগত সভায় আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মানুষের এ গুনাবলীই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছে। আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা। এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার দৈহিক অংগ প্রত্যংগগুলোকে পছন্দমত কাজে নিয়োজিত করে। এক্ষেত্রে সে ভাল-মন্দ উভয় কাজই করে থাকে। তার ইচ্ছা অনুসারে চোখ গুনাহের জিনিসও দেখে, আবার পূণ্যের জিনিসও দেখে। হাত ভাল কাজও করে, আবার অন্যায় কাজও করে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার বিদ্রোহ বা অপারগতা প্রকাশের কোন সুযোগ তাদের নেই। কর্তার নির্দেশ পালনই তাদের একমাত্র ধর্ম। চিন্তা ও কর্মের এ স্বাধীনতার কারণেই মানুষকে তার ভাল-মন্দ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ প্রদত্ত এসব শক্তি ও ক্ষমতা, ইচ্ছা ও অনুভূতিকে কাজে প্রয়োগ করে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে পারে। আর বিকাশের ধারায় কেউ হয় মুসা, আর কেউ হয় ফেরাউন, কেউ হয় ইবরাহীম, আর কেউ হয় নমরূদ। যারা তাদের দেহসত্তা অর্থাৎ বস্তুবাদী ধ্যান ধারনার বিকাশ ঘটায় তারা হয় শয়তানের পতাকাবাহী। আরা যারা তাদের আত্মিক ও নৈতিক শক্তির উন্নতি সাধন করে তারা হয় মুত্তাকী তথা হিজবুল্লাহ বা আল্লাহর সৈনিক।

এ প্রসংগে আমরা আলকোর আনের বক্তব্য জানতে সচেষ্ট হবো।

"চিন্তা করে দেখো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করে এনেছেন এমন এক অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতেনা। অতপর তিনি জানা ও বুঝার জন্যে তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, হৃদয়

www.pathagar.com

দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তোমাদের স্রষ্টার শোকর আদায় করতে পারো।" (আরাফ ঃ ৭৮)

"আমি কি (ভালো-মন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি? (দেখার পর সে ভোগের বস্তুটির উপকারিতা, অপকারিতা বোঝার ও বলার জন্যে) আমি কি তাকে একটি জিহবা ও দুটো ঠোঁট দেইনি? (অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে দেখে আবার তা যাচাই বাছাই করে নেয়ার জন্যে) আমি কি তাকে ন্যায় অন্যায়ের দুটো সুস্পষ্ট রাস্তা বলে দেইনি? " (আল বালাদ ঃ ৮-১০)

"তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে (পরিমান মত যাবাতীয় উপাদান দিয়ে সুঠামও) সুবিন্যস্ত করে বানিয়েছেন। তার ইচ্ছে মতো যেভাবেই চেয়েছেন সেই আঙ্গিকেই তোমাকে গঠন করেছেন।" (আল ইনফিতার ঃ ৭-৮)

"হে নবী, তোমার মহান প্রতি পালকের নামের তাসবীহ পাঠ করো, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে তৈরী করেছেন। (প্রয়োজনীয় সকল উপাদান দিয়ে) তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি সব কিছুর (পরিমান মতো) তকদীর গড়ে দিয়েছেন। তিনি (মানুষদের) চলার পথ বাতলে দিয়েছেন।" (আল আ'লা ঃ ১-৩)

"শপথ করছি আত্মার ও তার যথাযথ বিন্যাসের। অতপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।" (আশ্- শামস ঃ ৭-৮)

"সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।" (আর-রহমান ঃ৩-৪)

"মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে তখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্র বিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করবো। অতপর তাকে করেছি শ্রবন ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।" (আদ দাহর ঃ ১-৩)

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। তিনি নভোমন্ডল বা ভূমন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি।" (আত্-তাগাবুনঃ২-৩)

"তিনি যা কিছুই বানিয়েছেন তা খুবই সুন্দর করে বানিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি হতে। পরে তার বংশ ধারা এমন এক বস্তু হতে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতই। পরে নাক-কান ঠিক-ঠাক করে দিয়েছেন এবং তাতে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, চক্ষু দিয়েছেন ও দিল দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই শোকর গুজার হয়ে থাকো।" (আস-সাজদাহ ঃ ৭-৯)

www.pathagar.com

বিজ্ঞানময় কোরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াতে আমরা মানুষের সুন্দরতম দৈহিক কাঠামো এবং সুবিন্যস্ত অংগ-প্রত্যংগের খোদা প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করি। যেহেতু কোরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় তাই আমাদের চিন্তা-গবেষণার জন্য এক্ষেত্রে অল্প কথায় ইংগিত দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষের আংগিক গঠণ পদ্ধতি, তার সূক্ষতা ও জটিলতা এবং তার সংহতি ও অখন্ডতার চমকপ্রদ বিবরণ নিয়ে এ যাবত অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সেসবের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। তাছাড়া আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ করে মেডিকেল কলেজগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাসত্বেও, আমাদের বিষয়বস্তুর দাবী অনুযায়ী মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে খোদায়ী কুদরত বুঝার সুবিধার্থে মানব দেহের কতিপয় অংগ-প্রতংগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। তবে শুরুতে মানব দেহের অংশগুলো সংক্ষেপে জেনে নেই।

মানুষের দৈহিক কাঠামোর সাধারণ অংগগুলো হলো ঃ অস্থিমন্ডল, অন্ত্রমন্ডল, চামড়া, পরিপাকতন্ত্র, রক্ত সঞ্চালন প্রাণালী, শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা, জননেন্দ্রীয় প্রণালী, স্নায়ু মন্ডল, প্রস্রাব যন্ত্র, আস্বাদন ব্যবস্থা, আঘ্রাণ ব্যবস্থা, শ্রবনেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয়। মানবদেহের উল্লেখিত বিষয় সমূহ এত অধিক বিস্ময়কর যে, এগুলোর সংগে মানুষের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক বা শিল্প কর্মের কোনরূপ তুলনা চলেনা। মানুষ অনেক কিছু নিয়ে ভাবে, চিন্তা করে, কিন্তু নিজ সত্ত্বা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনা। অবশ্য মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তার সৃষ্টি ও সত্ত্বা নিয়ে জ্ঞান-গবেষণার জন্য। মানুষ আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করলেও সন্দেহাতীতভাবে বলতে হয় মানুষের সত্ত্বায় বিদ্যমান বিভিন্ন অংশগুলি কল্পনাতীতভাবে সূক্ষ্ম, গভীর ও বৃহৎ।

মানুষের অংগ প্রতংগের বিস্ময়কর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সাইয়েদ কতুব শহীদ প্রণীত তাফসীর ফী জিলালিল কোরআনের সুরা আল ইনফিতারের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত বর্ণনা হতে একটি উদ্বৃতি দেয়া হলো ঃ

"ইংলিশ সাইন্স ম্যাগজিনে বলা হয়েছে যে, মানুষের হাত সবচেয়ে অতুলনীয় বিস্ময়। দ্রুত সংকোচন সম্প্রসারণশীল। সহজ কর্মক্ষমতা ও ব্যবহারের ব্যাপকতায় হাতের সমকক্ষ কোণ যন্ত্র তৈরী করা শুধু কঠিন নয় বরং একেবারেই অসম্ভব। যখন কেউ একটা বই পড়তে ইচ্ছা করে, তখন সে নিজ হাত দ্বারা তা প্রথমে ধরে, তারপর তাকে পড়ার উপযুক্ত স্থানে রাখে। এই সময় এই হাতই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার অবস্থানকে শুধরে দেয়। যখন সে তার একটি পাতা উল্টাতে চেষ্টা করে, তখন তার আংগুলগুলোকে পাতার নিচে স্থাপন করে। অতঃপর যতটুকু চাপ দিলে পাতা ওল্টানো যায় আঙ্গুলে ততটুকুই চাপ দেয়। তারপর পাতা ওল্টানোর সাথে সাথে সেই চাপের ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। হাতই কলম ধরে এবং তা দিয়ে লিখে। চামচ থেকে শুরু করে টাইপ যন্ত্র পর্যন্ত মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামকে এই হাতই ব্যবহার ও নাড়াচাড়া করে। জানালা দরজা খোলে ও বন্ধ করে, মানুষ যা চায় তা বহন করে। দুই হাতে ২৭ টি অস্থি রয়েছে এবং প্রত্যেক

www.pathagar.com

হাতের ১৯টি শীরাতন্ত্রী রয়েছে।" (আধুনিক বিজ্ঞান ও আল্লাহ : অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক নওফেল)।

"বিজ্ঞান মানুষকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ মানুষের কানের একটি অংশ (অর্থাৎ কানের ভিতরের অংশ) প্রায় চার হাজার সুক্ষ ও জটিল বক্র যন্ত্রের সমষ্টি। এর প্রত্যেকটি যন্ত্র আকৃতি ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে ধারাবাহিকভাবে এক সাথে বাঁধা। বলা যেতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র যন্ত্রগুলো বাদ্য যন্ত্র সদৃশ। মনে হয় এটি এমন একটি হাতিয়ার যা মেঘের গর্জন থেকে শুরু করে গাছের পাতায় মর্মর ধ্বনি এবং বাদ্যযন্ত্রের মিহিসুর পর্যন্ত সকল তীব্র বা মৃদু শব্দকে মগজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

'আধুনিক বিজ্ঞান ও আল্লাহ' নামক গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে ঃ দর্শন যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে চোখ, যা ১৩ কোটি আলো বিকিরণকারী যন্ত্রের সমষ্টি এবং এই সকল যন্ত্র হচ্ছে স্নায়ুর কেন্দ্রবিন্দু। ভ্রু আচ্ছাদিত চোখের পাতা চোখকে দিন রাত রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং এই পাতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নড়াচড়া করে। এটি নাড়াতে কোন ইচ্ছার দরকার হয়না। ধুলবালি, মাটি, কংকর প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষতিকর বহিরাগত জিনিস থেকে এই পাতাই চোখকে রক্ষা করে। অনুরূপভাবে ভ্রুর ছায়া তাকে সূর্যের উত্তাপের প্রখরতা থেকেও রক্ষা করে। চোখের পাতায় ক্রমাগত উত্থান-পতন চোখকে বহিরাগত ক্ষতিকর জিনিষ থেকে রক্ষা করা ছাড়াও চক্ষুর শুষ্কতা প্রতিরোধ করে। চোখের পানি যাকে অশ্রু বলা হয়ে থাকে, তা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী নিষ্কাশক।

আর মানুষের আস্বাদন যন্ত্র হলো জিহবা। প্রতিটি মানুষের শৈল্পিক ঝিল্লীর জীবানু সমূহের মধ্যে বিরাজমান বিপুল সংখ্যক আস্বাদ কোষই জিহবার কর্মতৎপরতার উৎস আর ঐসব জীবানু বিভিন্ন আকৃতির। কতক আছে সুতোর মত, কতক ছত্রাক ধরণের, কতক মসুরের দানার মত। জিহবার যে স্নায়ুতন্ত্রী খাদ্য নালীর সাথে সংযুক্ত তার শাখা প্রশাখাই এই সব জীবানুর খাদ্য যোগায়। আহারের সময় কেবল স্বাদতন্ত্রীতেই প্রতিক্রিয়া হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া তৎক্ষনাৎ মগজে পৌঁছে যায়।

জিহবা মানুষের মুখগহবরের সম্মুখভাগেই বিদ্যমান, যাতে ক্ষতিকর জিনিস মাত্রকেই সে সংগে সংগে উগরে ফেলে দিতে পারে। কোন জিনিস তিক্ত না মিষ্ট, ঠান্ডা না গরম, টক না লোনা, কোমল না কটু, তা মানুষ এই যন্ত্রটি দ্বারাই টের পায়। জিহবার রয়েছে ৯ হাজার সুক্ষ্ম আস্বাদন কেন্দ্র, যার প্রতিটি একাধিক স্নায়ুতন্ত্রী দ্বারা মস্তিস্কের সাথে সংযুক্ত। এখন স্নায়ুতন্ত্রীর সংখ্যা কত ও আকৃতি কেমন এবং কিভাবে তা স্বতন্ত্র ও এককভাবে কাজ করে এবং কিভাবেই মস্তিস্কের সাথে অনুভূতির সংযোগ ঘটায় সে প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন।

সমগ্র দেহের উপর পূর্ণাংগ প্রাধান্য বিস্তারকারী স্নায়ুতন্ত্রী এক ধরণের সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট নল দ্বারা তৈরী। এই নলের সংখ্যা বহু এবং তা শরীরের সর্বত্র বিস্তৃত। এই নলগুলো তার চেয়েও বড় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হয়। তাই শরীরের কোন একটি অংশও যখন কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়

www.pathagar.com

তা চারপাশের পরিবেশে বিরাজমান তাপের সামান্য পরিবর্তনের কারনেই হোক না কেন স্নায়ুতন্ত্রীগুলি সে অনুভূতিকে পৌঁছিয়ে দেয় মস্তিস্কে। এই অনুভূতি মস্তিষ্ককে কর্মক্ষম ও সক্রিয় করে তোলে। স্নায়ুতন্ত্রীতে ইংগিত ও সংকেতের যাতায়াতের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে একশো মিটার। (আল্লাহ ওয়াল ইলমুল হাদীস- আল্লাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান)।

আর আমরা যখন হজম প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দেই এবং পরিপাকযন্ত্রকে একটা রাসায়নিক কারখানা হিসাবে এবং যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তাকে অপ্রক্রিয়াজাত দ্রব্য হিসাবে বিবেচনা করি, তখন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, ওটা একটা বিস্ময়কর প্রক্রিয়া। কারণ এই প্রক্রিয়া খোদ পরিপাক যন্ত্রটি ছাড়া আর প্রায় সকল ভুক্ত দ্রব্যকে হজম করে ফেলে। প্রথমে তো আমরা এতে হরেক রকমের খাদ্য নিক্ষেপ করি কাঁচামাল হিসাবে। এ সময়ে খোদ কারখানা সম্পর্কে যেমন আমরা কোন কথা বিবেচনায় আনিনা, তেমনি পরিপাক ক্রিয়া কিভাবে কোন্ রাসায়নিক তত্ত্ব অনুসারে পরিচালিত হয় তাও ভেবে দেখিনা। আমরা গোশ্ত, ভুনা মাছ ও তরিতরকারী ইত্যাদি খাই এবং যে কোন পরিমান পানি দ্বারা তাকে পাকস্থলীতে ঠেলে দেই।

অতঃপর এই মিশ্রন থেকে পাকস্থলী বেছে নেয় শুধুমাত্র উপকারী দ্রব্যগুলিকে। প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যকে সে চূর্ণবিচূর্ণ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে একাজটি সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়া অতিরিক্ত জিনিসগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়না।

অতঃপর বাদবাকী দ্রব্যগুলোকে সে পূনরায় নতুন প্রোটিনে পরিনত করে- যা বিভিন্ন কোষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিপাকতন্ত্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় চুন, গন্ধক, আয়োডিন, লোহা এবং অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করে। সেই সাথে এ ব্যাপারেও যত্নবান থাকে যাতে এসব জিনিসের মৌলিক উপাদানগুলো নষ্ট না হয়, হরমোন উৎপাদনের সম্ভাবনা অক্ষুন্ন থাকে, জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক যাবতীয় জিনিস যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমানে বিদ্যমান থাকে এবং যেকোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রস্তুত থাকে। পরিপাক তন্ত্র যা পাকস্থলীর ক্ষুধাসহ যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য তেল ও অন্যান্য অত্যবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রাখে।

মানুষের যাবতীয় চিন্তা গবেষণা কিংবা যুক্তিতর্ক প্রদর্শণ সত্ত্বেও উল্লেখিত কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। বস্তত আমরা এই সমস্ত অগনিত উপকরণ উল্লিখিত রাসায়নিক কারখানায় প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে থাকি। কিন্তু আমরা কি কি জিনিস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছি, সেগুলো প্রায় পুরোপুরিই আমাদের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত থাকে। (অর্থাৎ প্রতিটি আহার্য দ্রব্যের দোষগুন বিবেচনা করিনা)।

জীবন ধারণের জন্য এই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার ওপরই আমরা নির্ভর করে বসে থাকি। যখন এই সকল ভুক্ত দ্রব্য হজম হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং

www.pathagar.com

নবতর জিনিসে পরিনত হয়, তখন দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান কোটি কোটি কোষের মধ্য থেকে প্রতিটি কোষের কাছে তাকে প্রতিনিয়ত পৌঁছানো হতে থাকে। এক একজন মানুষের দেহে বিদ্যমান এইসব কোষের সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যার চেয়েও বেশী।

প্রতিটি স্বতন্ত্র কোষের কাছে এই সরবরাহ প্রতিনিয়ত চালু থাকা জরুরী। আর এটাও জরুরী যে, সেই নির্দিষ্ট কোষটির জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন , তা ছাড়া অন্য কোন উপকরণ যেন তাকে সরবরাহ করা না হয়। নির্দিষ্ট কোষটির ঐ উপকরণগুলোর প্রয়োজন হয় ওগুলোকে দিয়ে হাড়, নখ, গোশত, চুল, চোখ ও দাঁত গঠনের জন্য। সংশ্লিষ্ট কোষটি এসব উপকরণ পাওয়া মাত্রই হাড়, গোশত, দাঁত, চোখ ইত্যাদি গঠন করা শুরু করে দেয়।

অতএব এটা এমন একটা রাসায়নিক কারখানা, যা মানুষের মেধা দ্বারা উদ্ভাবিত যে কোন কারখানার তুলনায় ঢের বেশী উৎপাদন করে। এখানে এখন একটা সরবরাহ ব্যবস্থাও তৎপর, যা দুনিয়ার মানুষের চেনাজানা যে কোন পরিবহন ব্যবস্থা বা বন্টন ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বড় ও বিশাল। এখানে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন হয় সর্বোচ্চ পর্যায়ের শৃংখলার সাথে। (আল-ইলমু ইয়াদয়ূ ঈমান- ঈমানের প্রেরণা সৃষ্টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।" (ফী যিলালিল কোরআন)

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যে তিনিই তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন। মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম এ এক অপার নেয়মত। এখানে এই নেয়মত সম্পর্কে ফী যিলালিল কোর আন হতে অন্য একটি উদ্বৃতি প্রদান করছিঃ

"শুধু কথা বলার শক্তি ও অংগ প্রত্যংগ সৃষ্টি করাই এমন এক অপার বিস্ময় যা ভেবে কুলকিনারা পাওয়া যায়না। যে অংগগুলো একত্রিত হয়ে মানুষের কথা বলা ও উচ্চারণ করার কাজটি সম্পন্ন করে তা হচ্ছে, জিহবা, দুই ঠোঁট, চোয়াল, দাঁত, গলা, জিহবা, শ্বাসনালী ও ফুসফুস। এ অংগগুলো দ্বারা শব্দ উচ্চারণের জটিল যান্ত্রিক কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে মাত্র। যা পরবর্তী পর্যায়ে কান, মগজ ও স্নায়ুমন্ডলীর সাথেও সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, অতঃপর বিবেক বা বুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এই বিবেক জিনিসটা যে কী, তা আমাদের অজানা, আমরা শুধু এর নামই জানি। এর মুল রহস্য কী জানিনা। এমনকি এর কাজ কী এবং কাজের পদ্ধতি কী তাও প্রায় আমাদের অজানা।

কীভাবে একজন মানুষ একটি শব্দ উচ্চারণ করে? এটি একটি জটিল কাজ। অনেকগুলো স্তর পার হয়ে, অনেকগুলো সরঞ্জাম ব্যবহার করে ও অনেকগুলো তৎপরতা চালিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। সেই সব স্তর ও সরঞ্জামের অনেকগুলোই এখনো অজানা ও গোপন।

কাজটি শুরু হয় এভাবে যে, প্রথমে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি দির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। অতপর এই অনুভূতি বিবেক বা বোধশক্তি বা আত্মা থেকে কার্যকর অনুভব যন্ত্র মস্তিষ্কে

www.pathagar.com

স্থানান্তরিত হয়। কিভাবে হয় তা কেউ জানেনা। মতান্তরে স্নায়ুমন্ডলীর মাধ্যমে কাংখিত বাক্যটি বলার আদেশ প্রেরণ করে। এই শব্দটি স্বয়ং আল্লাহই শিখিয়েছেন এবং তিনিই এর অর্থও জানিয়ে দিয়েছেন। এই পর্যায়ে ফুস ফুস এর অভ্যন্তরে সঞ্চিত বাতাসের খানিকটা বের করে দেয়। এই বাতাসটুকু শ্বাসনালী দিয়ে কণ্ঠনালীতে ও তার বিস্ময়কর যন্ত্রগুলোতে পৌঁছে। এই যন্ত্রগুলোর সাথে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতির তুলনা হয়না। এমনকি শব্দ উচ্চারণে ব্যবহৃত সকল অংগ-প্রত্যংগ থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অতুলনীয়। এখানে বাতাস পৌছে তা কণ্ঠে এক শব্দের সৃষ্টি করে। অতপর বিবেক নিজের ইচ্ছামত ঐ শব্দের রূপান্তর ঘটায়। বিবেকই তাকে বিকট, কিংবা ছোট, দ্রুত কিংবা ধীরগতি সম্পন্ন এবং কর্কশ কিংবা সুরেলা শব্দে পরিনত করে। অতপর কণ্ঠনালীর সাথে জিহবা, ঠোঁট, চোয়াল ও দাঁত মিলিত হয়ে উক্ত শব্দ সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। এ হচ্ছে একটি মাত্র শব্দ তৈরীর প্রক্রিয়া। এরপর রয়েছে বাক্য তৈরী , বিষয় নির্বাচন, ধ্যান-ধারনা ও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আবেগ ও অনুভূতি নির্ণয়ের কাজ। এর প্রতিটিই এক একটা বিচিত্র জগত, যা এই বিষ্ময়কর প্রাণী মানুষের ভেতর জন্ম লাভ করে। এটা একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ফলেই জন্মলাভ করে থাকে।" (ফী যিলালিল কোরআন)

এখানে মানব দেহের অসংখ্য অংগ প্রত্যংগের মাত্র কয়েকটির গঠন ও তাদের বিষ্ময়কর কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষের পক্ষে এসব যন্ত্রপাতি বিশেষ করে এ মানে তৈরী করা আদৌ সম্ভব কিনা ? যেসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম অংগ তৈরী হচ্ছে তার অর্থনৈতিক ও কারিগরী মূল্যের কথা ভাবুনতো? সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির জন্যেও এসব যন্ত্রের সমন্বয়ে একটি মানুষের মালিক হওয়া অসম্ভব। একজন মানুষের দেহ হতে একটি অংগ (কিডনী, চক্ষু) সংগ্রহ করে অন্য কোন মানুষের দেহে সংযোজনের ব্যয়ভারও ঝুঁকির কথাই একবার বিবেচনা করুন। কি ভাবছেন? এটি খুব সস্তা! অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এসবই মহা বিজ্ঞানী মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকুশলতার পরিচায়ক! মহান আল্লাহ প্রদত্ত পরম নেয়ামত। আর তাইতো মহাগ্রন্থ আলকোরআনের সুরা ইনফিতারে তাঁর ঘোষণা, ' হে মানুষ ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুগঠিত করেছেন ও সুসমঞ্জস্য করেছেন ?'

মানুষের দেহসত্তা, যার বিস্ময়কর গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো এসবই মানুষ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা নয়। এটি হলো মানুষের পশু সত্তার পরিচয়। মানুষের রয়েছে অন্য একটি সত্তা, আর তা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে আগত ' রূহ ' বা আত্মা। মানুষ এ রূহের কারণেই মানুষ। এ রূহের কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। কিন্তু মানুষ এ রূহের পরিচয় জানেনা-তাদের পক্ষে তা জানা সম্ভবও নয়। এই রূহই মানুষকে ফেরশতার চেয়ে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন

www.pathagar.com

করেছে এবং তাকে দান করে আল্লাহর সংগে মিলিত হওয়ার ক্ষমতা। আর এ রূহের যথাযথ বিকাশের উপরই নির্ভর করে মানুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় সম্ভাবনার প্রকাশ ও বিকাশ। এরূহের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে মানুষের ব্যক্তিসত্বা। যারা এ রূহকে অস্বীকার করে তারা নফসের দাস ও শয়তানের চেলা চামুন্ডা। দুনিয়ার জীবন তথা পার্থিব সুখ-শান্তিই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ক্ষমতাই তাদের নিকট সাফল্যের মাপকাঠি। সততা, নৈতিকতা, তাকওয়া এসব তাদের জীবনে মূল্যহীন চেড়া কাপড়ের টুকরা সদৃশ। তাদের বিবেকবোধ বলতে কিছু নেই। লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক সবকিছুই তাদের কাছে বৈধ।

মানুষের এই দ্বিতীয় সত্তা অর্থাৎ রূহের কারণে মানুষের রয়েছে নৈতিক অস্তিত্ব। অর্থাৎ ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বোধ। সৃষ্টি সূত্রে মানুষ এ জ্ঞান লাভ করেছে। কোরআনের ঘোষণা, "মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন। তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে নফস্‌কে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।"

আলকোরআনের এ আয়াতের প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, ন্যায়-অন্যায় এবং ভালো-মন্দের যে যোগ্যতা মানব সত্তায় বিদ্যমান তা মানুষের অর্জিত বৈশিষ্ট্য নয়, এটি তার আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ। তার প্রকৃতির মাঝে আল্লাহ পাক নিজেই এ ক্ষমতা দান করেছেন। জন্মগতভাবে এবং প্রকৃতি প্রদত্ত (আল্লাহর দান) এই যোগ্যতা উপরোক্ত আয়াতে ইলহাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র ভালো-মন্দের এ বোধ ও বুঝকে হেদায়েত বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ঃ 'আমি দেখিয়েছি তাকে দুটি পথ।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের এই ক্ষমতা তার মজ্জাগত বা তার অন্তরের অন্তঃস্থলের মধ্যে গোপনে লুকিয়ে আছে যা প্রকাশিত হয় ভাল বা মন্দ যে কোন একটি কাজ করার প্রস্তুতি আকারে। মহান আল্লাহ যিনি মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু রেসালাতের মাধ্যমে এবং বাহ্যিক কার্যকারণ দ্বারা মানুষের সত্তায় বিদ্যমান এসব সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা, তীব্র করা ও শানিত করার ব্যবস্থা করেছেন। অতএব ভাল-মন্দের তারতম্যবোধ এটা মানুষের নিজস্ব সৃষ্ট কোন গুন নয়, এটি হলো প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত এক মহাগুন। এটা মানুষের ব্যক্তি সত্তার মাঝে লুকিয়ে থাকে এবং আল্লাহ যেভাবে চান, যখন চান অতি সংগোপনে মানুষের মাঝে তা জেগে উঠে।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এ অনুভূতিকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা তাকে দান করেছেন। তিনি মানুষকে সুযোগ দান করেছেন এশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে, নিজেকে মহান আল্লাহর খলীফা ও দাস হিসেবে গড়ে উঠতে। আর এভাবে গড়ে উঠে মানুষের ব্যক্তিত্ব। যারা এ শক্তিকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগায় তাদের আদর্শ হলো আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসুলগন এবং তাঁর ছালেহ বা সৎ

www.pathagar.com

বান্দাগন। পক্ষান্তরে যারা খোদাপ্রদত্ত এ প্রাকৃতিক শক্তির অবমাননা করে, নিজেদেরকে পাশবিক শক্তির উপর ছেড়ে দেয় এবং নিজেদেরকে কামনা, বাসনা ও লালসার দাসে পরিনত করে তারা শয়তানের চেলা-চামুন্ডা। তাদের আদর্শ হলো ফেরাউন, নমরূদ ও বুশরা। এরা মানবতার দুশমন ও খোদাদ্রোহী। পৃথিবীতে সকল অন্যায় ও ধ্বংসের প্রতীক হলো এসব ব্যক্তিবর্গ।

মহাগ্রন্থ আলকোরআনে আল্লাহ তায়ালা পবিত্রাত্মা মহান নবী ও রাসুলগণের এহেন উন্নত ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয় যে গুনাবলীর উল্লেখ করেছেন তাহলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আত্মিক ও নৈতিক শক্তি। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি লক্ষ্যণীয় ঃ

"আমি (মুসার যামানার) আগে ইবরাহীমকে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম।" (আম্বিয়া-৫১)

"(ইবরাহীমের মতো) আমি লুতকেও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম।" (আম্বিয়া ঃ ৭৩)

"অবশ্য আমি তাদের উভয়কেই (দাউদ ও সোলায়মান) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছি।" (আম্বিয়াঃ ৭৯)

আল্লাহর পক্ষ হতে তালুতকে বাদশা নিযুক্ত করা প্রসঙ্গে নবীর জবানীতে আল্লাহ বলেন ঃ

"আল্লাহর নবী বললো, তোমাদের ওপর শাসন ক্ষমতা চালানোর জন্যে আল্লাহ তাকেই বাছাই করেছেন এবং (রাজত্বের যোগ্য করে তোলার জন্যে) সে পরিমান তার শারীরিক যোগ্যতা ও জ্ঞানগত (প্রতিভা) আল্লাহ তায়ালা বাড়িয়ে দিয়েছেন।" (বাকারা ঃ ২৪৭)

আল্লাহর মনোনীত সকল নবীই দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে তাদের সময়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তারা আজও প্রাতঃ স্মরণীয়। এক্ষেত্রে আমাদের নবী সকল যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বর্তমান যুগে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার তাদের তৈরী তালিকায়ও প্রথম ব্যক্তি আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)। নবীরা ছিলেন তাদের যুগের নেতা, আর আমাদের নবী সর্বযুগের নেতা। আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়াও তাদেরকে অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যেগুলি তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। আলকোরআনে এ সংক্রান্ত আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"অতপর আমি ইবরাহীমকে (ছেলে হিসেবে) ইসহাক দান করলাম, তার ওপর আরো দান করলাম (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব, এদের সবাইকেই আমি ভালো মানুষ বানিয়েছিলাম। (সর্বোপরি) আমি তাদের (দুনিয়ার মানুষের) নেতা বানিয়ে ছিলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) সুপথ দেখাতো, নেক কাজ করা, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা ও জাকাত দেয়ার জন্যে আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, (সব কাজে) তারা আমারই আনুগত্য করতেন।" (আম্বিয়া ঃ ৭২-৭৩)

www.pathagar.com

নবী ও রাসুলদের অনুসারীদের মধ্যে যারা যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন তারাও সুগঠিত ও সুন্দর দেহ কাঠামো এবং উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আমাদের এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন এমন কতিপয় ব্যক্তিত্ব যেমন, খাজা মাইনউদ্দিন চিস্তী (রা), খান জাহান আলী (রাঃ)। তারা শুধুমাত্র মুসলমানদের নিকট সম্মানিত নন, অমুসলমানদের নিকটও সমভাবে সম্মানিত। আর এটা সম্ভব হয়েছে তাদের ওহীলব্ধ জ্ঞান ও তাকওয়ামূলক জীবন ধারার ফলশ্রুতিতে।

পক্ষান্তরে সমাজ ও রাষ্ট্রে যারা সন্ত্রাস ও অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের হাতিয়ার হলো বংশীয় বা গোত্রীয় আভিজাত্য, অর্থ এবং পেশী শক্তি। এটি আজকের বিশ্বের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য অতীতেও তেমনিভাবে চালু ছিল। ইতিপূর্বে উল্লেখিত কোরআনের সুরা আলবাকারার ২৪৭ নং আয়াতে তালুতকে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের বাদশা নিযুক্ত করা হলে তারা আপত্তি জানিয়ে বলেছিল সে কিভাবে বাদশা হবে। তার অর্থ সম্পদ নাই এবং সে বংশীয়ভাবে আমাদের চেয়ে অনেক দুর্বল। অতএব এটা মানা যায়না। নেতৃত্বের অধিকার আমাদের।

অতএব আল্লাহর খলীফাদের দায়িত্ব হলো সুন্দর দেহ ও নিষকলুস মনের অধিকারী হওয়া। আর এজন্য প্রয়োজন কোরআন ভিত্তিক জ্ঞান চর্চা এবং তাকওয়ামূলক জীবন গড়ে তোলা। কারণ কোরআনের ভাষায় আল্লাহর নিকট তারাই শ্রেষ্ঠ যারা মুত্তাকী।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থাপনা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তার খলীফা মানুষকে অতি উত্তম কাঠামো দিয়ে তৈরী করেছেন। মানুষের দেহে ফুঁকে দিয়েছেন আপন রূহ। মানুষকে দান করেছেন ভালো-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান ও অনুভূতি। অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় পৃথিবীতে মানব বংশের বিস্তার এবং তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার লক্ষে প্রজনন প্রক্রিয়া চালু করেছেন।

মানুষের সৃষ্টি ও পৃথিবীতে মানববংশ বিস্তার নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের বিভিন্ন উপাদান তৈরী করেছেন। তিনি পৃথিবীকে সাজিয়েছেন মানুষের বসবাসের উপযোগী করে। শুধুমাত্র মানুষের খাবার আয়োজন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি মানুষের অন্নসংস্থানের পাশাপাশি তার বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট-যানবাহন সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে মানুষের সেবা ও কল্যানে নিয়োজিত করেছেন। আকাশের বৃষ্টি ও পৃথিবীর মাটির সম্মিলন না ঘটলে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়না। জীব-জন্তু ও বৃক্ষ-লতার জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটে না। ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

এখন দেখা যাক মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ পাক মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আলকোরআনে কি বলেছেন-

"জমিনের উপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রিজিক পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই। তিনি যেমন এ জীবদ্দশায় তার আবাস সম্পর্কে অবহিত, তেমনি তার মৃত্যুর পর তাকে যেখানে সোপর্দ করা হবে তাও তিনি জানেন। তাঁর এসব কথা একটি মহা মূল্যবান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।" (হুদ ঃ ৬)

"আমি জমিনকে বিস্তৃত করে বিছিয়ে দিয়েছি তাতে আমি পর্বতমালাকে (পেরেকের মতো করে) গেড়ে দিয়েছি যেন তা নড়তে না পারে এবং তাতে প্রতিটি জিনিস আমি সুপরিমিতভাবে উৎপাদন করেছি। ওতে আমি জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের জন্যেও এবং অন্যসব সৃষ্টিরজন্যে যাদের কারোই রেজেকদাতা তোমরা নও। কোনো জিনিস এমন নেই- যার ভান্ডার আমার হাতে মজুদ নেই, কিন্তু তা আমরা প্রয়োজন মতো সুনির্দিষ্ট একটি নিয়ম মোতাবেকই সরবরাহ করে থাকি।" (আল হেজর ঃ ১৯-২১)

"তিনিই তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের সবার জন্যে এই পৃথিবীকে তিনি বাসস্থান ও আরামের স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনগুলোকে এভাবেই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। তিনিই আসমান থেকে পানির ধারা নাজিল করেন। অতপর সেই পানি দিয়েই তিনি সব রকমের উদ্ভিদ ও

www.pathagar.com

গাছপালা জন্মানোর ব্যবস্থা করেন। অনন্তর তা থেকে সবুজ শ্যামল পাতা উদগত করান, পরে এক পর্যায়ে তা থেকে ঘন পরস্পর জড়ানো শস্যদানা সৃষ্টি করেন এবং ফলের ভারে নুয়ে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনেন, বাগানে আংগুরের উদ্যানমালা, জলপাই ও আনার উৎপাদন করেন যেগুলো একে অন্যের সদৃশ হয়। আবার কখনো কখনো বৈশিষ্টের দিক থেকে একটির সাথে অন্যটির কোনো মিলও থাকেনা। এই বিচিত্র ধরণের গাছ যখন সুশোভিত হয়, যখন তা ফলবান হয়, আবার যখন ফলগুলো পাকতে শুরু করে, তখন তোমরা দেখো অবশ্যই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।" (সুরা আল আনআম ঃ ৯৮-৯৯)

"গবাদি পশুর মধ্যে কিছু পশু হচ্ছে ভারবাহী ও কিছু হচ্ছে (যবাই করে) খাবার জন্যে। আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের জীবিকা রূপে দান করেছেন তা তোমরা খাও এবং (হালাল হারামের ব্যাপারে) কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কেননা সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (আল আনআম ঃ ১৪২)

"তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্যে ওতে শীত বস্ত্রের উপকরণসহ আরো অনেক ধরণের উপকার সামগ্রী রয়েছে। সর্বোপরি তাদের কিছু অংশকে তোমরা তো আহারও করে থাকো।" (আননাহল-৫)

"তোমাদের পন্য সামগ্রীর বোঝাও তারা শহরে বন্দরে নিয়ে যায়, যেখানে প্রানান্ত কষ্ট ব্যতীত তোমরা কোন দিনই সেসব সামগ্রী নিয়ে পৌঁছুতে পারতে না। অবশ্যই তোমাদের মালিক তোমাদের ওপর একান্ত স্নেহ পরায়ন ও পরম দয়ালু। তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আরোহন করা ছাড়া শোভা বর্ধনের ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া তিনি আরও এমন অনেক জন্তু জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন যার (পরিমান ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা অদ্যাবধি অবগত নও।" (আন নাহল ঃ৭-৮)

"তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন, তার কিছু অংশ হচ্ছে তোমাদের পান করার জন্যে আর কিছু অংশ হচ্ছে এমন যে, তা দ্বারা গাছ পালা জন্মায়- যার জংগলের মাঝে তোমরা তোমাদের জন্তু জানোয়ারকে প্রতিপালন করো। সেই পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্যে শস্য উৎপাদন করেন- যায়তুন, খেজুর ও আংগুরসহ বিভিন্ন ধরণের ফল জন্মান। (আন নাহল ঃ ১০-১১)

"তিদি সমুদ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন- যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা (মাছ ও তার) গোস্ত খেতে পারো এবং তা থেকে (মনিমুক্তার) গহনা আহরণ করো যা দিয়ে তোমরা অলংকৃত হতে পারো। তোমরা দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে ওর বুক চিরে জলযানগুলো এগিয়ে চলে এবং তোমরা এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার (রেজেকের) অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারবে। তোমরা যেন তার শোকর আদায় কর।" (আন নাহল ঃ ১৪)

www.pathagar.com

"আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্যে তোমাদের ঘরগুলোকে (শান্তির) নীড় বানিয়েছেন। তিনিই পশুর চামড়া দিয়ে (তাবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা ভ্রমনকালে তাকে (হালকা হওয়ায় সহজে বহন করতে) পরো, (আবার কোথাও খাটাতে হলেও) তাকে তোমরা সহজে খাটানোর মতো করে পাও, ওদের লোম ওদের কেশ থেকে তিনি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে তোমাদের অনেক ব্যবহারের (উপযোগী) সামগ্রী বানাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু (গাছপালা) সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অন্যদিকে তিনিই তোমাদের জন্যে পাহাড়ের মাঝে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আরও ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্যে পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের প্রচন্ড তাপ থেকে রক্ষা করে। মূলত তিনি এ ভাবেই তোমাদের ওপর তার নেয়ামত সমূহ পূর্ণ করে দেন, যাতে করে তোমরা তার অনুগত বান্দাহ হতে পারো।" (আন নাহল ঃ ৮০-৮১)

"আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তার মধ্যে কতেক প্রকারের ওপর অরোহন করতে পারো আর তাদের মধ্যে কতেক প্রকারের এমন আছে তোমরা যার গোস্ত খেতে পারো। তোমাদের জন্যে তাতে আরো বহুবিধ কল্যান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে এটাও আছে যে, তোমরা তার ওপর আরোহন করে তোমাদের নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের স্থানে উপনীত হতে পারো। তোমরা তাদের ওপর আরোহন ছাড়া নৌকার ওপরও আরোহন করো।" (আল মুমেন ঃ ৭১-৮০)

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারছি মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীকে কিভাবে সাজিয়েছেন। তিনি মানুষের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের খাবার হিসেবে তিনি মাছ, গোসত, ধান, গম, ফল, তরিতরকারী, সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। এগুলি কিভাবে উৎপাদন করতে হয় এবং কিভাবে ভোগ ব্যবহার করতে হবে তা শিখিয়েছেন। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেগুলি কিভাবে নির্মাণ করতে হবে তার নির্মাণ শৈলী শিক্ষা দান করেছেন। মানুষের যাতায়াত ও যোগাযোগের জন্য নানা ধরণের ভারবাহী জন্তু জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন এবং নদী ও সাগর পথে যাতায়াতের জন্য নৌকা বা জাহাজ তৈরীর পদ্ধতি শিক্ষা দান করেছেন। মানুষ তাদের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আজ আকাশে উড়ছে। একস্থান হতে অন্যস্থানে কোন মাধ্যম ব্যতীত সংবাদ প্রেরণ ও তথ্যের আদান-প্রদান করছে। এসবই মানুষের জন্যে আল্লাহর দান।

উপরের আয়াত সমূহে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মানুষের জন্য বহুমুখী খাদ্য উৎপাদনে পানির ভূমিকা। আসলে শুধুমাত্র মানুষের খাদ্য নয়, তার সৃষ্টির মৌলিক উপাদানও পানি। আল্লাহর ঘোষণা মতে সকল জীবন্তুই পানি হতে সৃষ্ট।

www.pathagar.com

"আল্লাহ তায়ালা বিচরণশীল প্রতিটি জীবকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু চলে বুকের উপর ভর দিয়ে, কিছু চলে দুপায়ের ওপর , আবার কিছু চলে চার পায়ের উপর ভর করে আল্লাহ তায়ালা যখন যা চান তাই তখন সৃষ্টি করেন। অবশ্যই তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" আননুর ঃ ৪৫)

"এই কাফের লোকগুলো কি ভেবে দেখে না যে, আসমান সমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতো-প্রতোভাবে মিশে ছিলো, অতপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি, আমি (এখানে) প্রাণবান সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (আম্বিয়া ঃ ৩০) আর পানির উৎস হলো বৃষ্টি। আর বৃষ্টির সম্পর্ক আকাশের সাথে। মানুষের রিজিকের সম্পর্কও এই পানির সাথে। তাইতো আল্লাহর ঘোষণা ঃ "আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা ও প্রতিশ্রুত অন্যান্য জিনিস (আয্যারীয়াত ঃ ২২)।"

মানুষের রিজিক প্রসঙ্গে এখানে কতিপয় প্রাকৃতিক কারখানার উল্লেখ করতে চাই। এসব কারখানার একটি হলো মাতৃস্তন। আল্লাহ তায়ালা মানব শিশু, যে জন্মের পর ভাত-মাছ-রুটি-গোসত খেতে পারেনা তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন মায়ের স্তনে। শিশু জন্মের পর হতে দু বছর মায়ের দুধ পান করে জীবন ধারণ করে। তার বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে দুধের ঘনত্বও বাড়তে থাকে এবং তার জন্যে যত প্রকার খাদ্য উপাদান প্রয়োজন সেগুলি মায়ের দুধে বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ পাক দয়া করে এ ব্যবস্থা না করলে মানব শিশুর বেঁচে থাকা ও জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়তো। ফলে মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হতো।

দ্বিতীয় প্রাকৃতিক কারখানা সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"অবশ্যই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মধ্যে (প্রচুর) শিক্ষার বিষয় মজুদ রয়েছে। তাদের উদরস্থিত (দুর্গন্দময়) গোবর ও (নাপাক) রক্তের মধ্য থেকে নিঃসৃত (পানীয়) খাঁটি দুধ আমি তোমাদের পান করাই-(দুধ) পানকারীদের জন্যে বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু।" (আন-নাহল ঃ ৬৬) মানব জাতির জন্যে আদর্শ খাদ্য দুধের গুনাগন ব্যাখ্যা করা আদৌ নিষ্প্রয়োজন। এছাড়া দুধ হতে ঘি, মাখন, মিষ্টান্নসহ কত রংবেরংয়ের খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কারো অজানা নয়।

তৃতীয় কারখানা সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"আর তোমার প্রভু ওহী করেছেন মৌমাছির কাছে, বলেছেন, পাহাড় পর্বত সমূহের মধ্যে তোমরা ঘর তৈরী কর, তৈরী কর উঁচু গাছে এবং এমন উঁচু জায়গায় যার নীচে চাক বাঁধতে পারো। তার পর সর্বপ্রকার গাছ থেকে তোমরা মধু সংগ্রহ করে খাও এবং ধীর শান্তভাবে তোমার প্রভুর পথে চলতে থাকো। এই মৌমাছির পেট থেকে বের হয় এমন বিভিন্ন রং এর শরবত যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়কারী ঔষধ। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে সেই জাতির জন্য নিদর্শন যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (আন-নাহল ঃ ৬৮-৬৯)

www.pathagar.com

এ কারখানাটি থেকে আমরা শুধুমাত্র খাদ্যের সন্ধান-ই পাইনা বরং রোগের ঔষধের সন্ধান এবং তার প্রস্তুত প্রণালী সংক্রান্ত নির্দেশনাও লাভ করে থাকি। আল্লাহ সত্যিই দয়াময় ও প্রেমময়। তিনি তাঁর বান্দাহদের জীবন জীবিকা ও বেঁচে থাকার জন্য সকল ব্যবস্থা করেছেন।

আমরা আল্লাহর কোরআন হতে মানুষের জন্য নির্ধারিত খোদায়ী জীবিকার নানা প্রকার ও উৎস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আরও জানতে পেরেছি যে, জীবনের ন্যায় জীবিকার হাতলও আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে প্রচুর পরিমান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিজিক সীমাবদ্ধ করে দেন। কিন্তু এ রিজিক বা জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষকে উদ্যোগী হতে হয়। রিজিকের অনুসন্ধানও আল্লাহর ইবাদত, যদি তা হয় তাঁরই নির্দেশিত পন্থায়। আর রিজিক হালাল না হলে কোন ইবাদাতই আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না এবং হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত দেহও জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে না।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বহুস্থানে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি দিনকে সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ জীবিকার অন্বেষণ করতে পারে। আর রাতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের কার্মক্লান্ত দেহের আরাম ও শান্তির জন্য। আল্লাহ তায়ালা ঈমানের সাথে যেমন আমলের ঘোষণা দিয়েছেন, জীবিকার প্রসংগেও তার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং তাঁর স্মরণের উল্লেখ করেছেন। কেননা আল্লাহর স্মরণ বিমুখ জীবিকার অনুসন্ধান বা বিভিন্ন পেশাজাত কাজকর্ম মানুষকে নিছক জানোয়ারে পরিনত করতে পারে। মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে ব্যাহত হবে। আবার জীবিকার কোনরূপ সন্ধান না করে শুধুমাত্র নামাজ রোজাও মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। অন্যের দান-অনুদানের উপর নির্ভরশীল জীবন অত্যন্ত অপমানজনক ও মর্যাদা হানিকর। আল্লাহর খলীফার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সুন্নাতের পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে সূরা জমুয়ার নিম্নোক্ত আয়াত বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য ঃ

"অতপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং সর্ববিস্থায় আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করতে থাকবে। আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।" (জমুয়া ঃ ১০)

আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা ও রিজিকদাতা। এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের সুযোগ নেই। আবার জীবন জীবিকার চাবিকাঠি তাঁর হাতে নিয়োজিত সেটিও সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এ প্রসংগে আল্লাহর বাণীঃ "আর আকাশে তোমাদের জীবিকা ও প্রতিশ্রুত অন্যান্য দ্রব্যাদি।" অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহই সর্বোত্তম রিজিক দাতা (জুমুয়া)।" আবার এ জন্যে প্রানান্তকর চেষ্টা চালাতে হবে এটাও তাঁরই ঘোষণা। কারণ এ পৃথিবী কর্মের স্থান, ভোগের নয়। যা কিছু ভোগ করতে হবে তা কর্মের মাধ্যমে অর্জন করতে

www.pathagar.com

হবে। আবার চেষ্টা প্রচেষ্টাই সবকিছু নয় পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে মুত্তাকী হতে হবে। আর ঈমান ও তাকওয়ামূলক জীবন অনুসরণ করলে আল্লাহ মানুষকে তার অজ্ঞাতে ও তার আকাংখার চেয়েও অধিক রিজিক দানে ধন্য করবেন। এ প্রসংগে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"অথচ যদি সেই জনপদের মানুষগুলি ঈমান আনতো এবং আল্লাহকে ভয় করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-জমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু (তা না করে) তারা (আমার নবীকেই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। সুতরাং তাদের যাবতীয় অন্যায় কর্মকান্ডের জন্যে আমি তাদের ভীষণভাবে শাস্তি দিলাম।" (আরাফ ঃ ৯৬)

অতএব প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য জীবিকার সন্ধানের পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি খাঁটি ঈমান পোষণ এবং মুত্তাকী হওয়া। আমরা যে যেই পেশাই নিয়োজিত থাকিনা কেন সেখানে অবস্থানকালে আল্লাহর নির্দেশ মত হালাল হারামের সীমা রেখা মেনে চলা, দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা না করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। কর্মক্ষেত্রে থাকার অজুহাতে নামাজ রোজা ও আল্লাহর অন্যান্য বিধান ত্যাগ না করা। আবার অতি মাত্রায় মুত্তাকী সাজতে গিয়ে দায়িত্ব-কর্তব্যে ফাঁকি না দেয়া।

www.pathagar.com

মানুষের শেষ পরিনতি

আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত জন্ম-মৃত্যুর খেলা প্রত্যক্ষ করছি। পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর হতে এ পর্যন্ত কত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে আর কত মানুষের মৃত্যু ঘটেছে তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা এ পুস্তকের শুরুতে বর্ণিত আদম (আঃ) এর সৃষ্টি কাহিনী ও পরবর্তীতে মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার আলোচনা থেকে মানুষের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমরা জানতে পেরেছি মানুষ আল্লাহ তায়ালারই কুদরতের বহিঃ প্রকাশ। তিনি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টির সেরা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বস্তুর বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি লাভ করে নাই, যেমনটা খোদাদ্রোহী নাস্তিকরা বিশ্বাস ও প্রচার করে থাকে। আমরা উপরোক্ত আলোচনা হতে এও জানতে পেরেছি যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেনা। মৃত্যুর পর মানুষের অন্য জীবন শুরু হয় এবং তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে ও পৃথিবীর জীবনের ভালো-মন্দ কর্মতৎপরতার ফলাফল হিসাবে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম দেয়া হবে। সুরা আরাফের যে স্থানে আদম (আঃ) এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে আল্লাহ বলেন, ' মনে রেখো আজ থেকে তোমরা ও শয়তান চিরদিনের জন্যে একে অপরের দুশমন। এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জমিনে থাকার উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জায়গা ও জীবন সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলো। আল্লাহ আরো বললেন- সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সবকিছুর শেষে একদিন সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।' অর্থাৎ মৃত্যুর মাঝেই মানব জীবনের শেষ নয়। বরং মৃত্যু হলো অন্য এক জীবনের পথে নব যাত্রার সূচনা মাত্র। এ যাত্রার শুরুতে মানুষ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্যে কবরে অবস্থান করবে। তারপর প্রলয়ংকারী কিয়ামত সংঘটিত হবে। কিয়ামতের ধ্বংস লীলা হতে আসমান জমিন কিছুই রেহাই পাবে না। আবার আল্লাহ নতুন করে সবকিছু সৃষ্টি করবেন এবং মানুষের মহা মিছিল মাটি ফুঁড়ে উঠে দৌড়াতে থাকবে হাশরের মহা সমাবেশে যোগদানের জন্য। এ সমাবেশে উপস্থিত হবে আদম (আঃ) হতে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছে এমন সকল মানুষ। এখানে আল্লাহ আদালত কায়েম করবেন। গোটা মানব জাতির কর্মের হিসেব গ্রহণ করবেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুনিয়াতে তাদের কৃতকর্মের বিনিময় দান করবেন। যারা তাঁর উপর ঈমান রেখে তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে তাদের জন্যে বরাদ্দ করা হবে অনন্ত শান্তি ও সুখের জায়গা জান্নাত। আর যারা তাঁর অবাধ্য হয়ে শয়তানের অনুসরণ করেছে তাদের জন্যে রয়েছে চির অশান্তির ও শাস্তির জায়গা জাহান্নাম। সুরা আল হেজর-এ ইতিপূর্বে আদম (আঃ) ও শয়তানের প্রসংগ আলোচনাকালে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, আর জেনে রাখো তোমার অনুসারীদের সবার জন্যে রয়েছে

www.pathagar.com

জাহান্নামের কঠিন আজাবের প্রতিশ্রুতি। তাতে থাকবে সাতটি বিশালাকার দরজা, আবার তার প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন দল। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তারা সবাই সেদিন থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণাধারার বহুমুখী নেয়ামতে। জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তাদের এই বলে অভিবাদন জানানো হবে যে, তোমরা শান্তি ও নিশ্চয়তার সাথে সেখানে প্রবেশ করো। তাদের পারস্পারিক ঈর্ষা বিদ্বেষ যাই থাকনা কেন, আমি তা তাদের মন থেকে দূর করে দেবো, তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থায় সেখানে অবস্থান করবে। সেখানে তাদের কোনরকম অবসাদ পর্যন্ত স্পর্শ করবেনা, তারা সেখান থেকে কোনদিন বহিষ্কৃত হবেনা। অতএব যারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নাই। মানুষ মাটি হতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং মৃত্যুর পর আবার মাটিতেই মিশে যাবে। কবর, হাশর, কিয়ামত, দোজখ, বেহেস্ত এসব মিথ্যা কল্পনা। কোরআনের ভাষ্য অনুসারে এরা মিথ্যাবাদী। তাদের মতবাদ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। অতীত ও বর্তমান সকল অবিশ্বাসীই এ প্রসঙ্গে অভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছে। কোরআনে তাদের বিভিন্ন যুক্তি ও তার অসারতা তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষের পূণর্জীবন ও পুরুত্থান প্রসংগে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসংগে জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত কোরআনের দর্শনটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ঃ

"তা (জমিন) থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং পরিশেষে তা থেকে তোমাদের দ্বিতীয়বার বের করে আনবো।" (ত্বাহা ঃ ৫৫)

এ প্রসংগে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহলো ঃ

"কিভাবে তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফরী করছো, অথচ তোমরা মৃত ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন। অতঃপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।" (আল-বাকারাঃ ২৮)

মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলকোরআন প্রদত্ত জীবন-মৃত্যুর দর্শন সংগতিপূর্ণ। মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি, ভ্রুনের পর্যায় ক্রমিক বিবর্তন এবং পৃথিবীতে আসার পর মানব শিশু যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করে, সেগুলো থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, যে মহান স্রষ্টার ইচ্ছা এই স্তরগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে, তিনি মানুষকে এমন এক জায়গায় পৌঁছাতে বদ্ধ পরিকর, যেখানে গিয়ে মানুষ তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হবে। ইহজগতে তার পক্ষে এই পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয়না। কেননা এখানে সে কিছুটা অগ্রগতি লাভ করে থেমে যায় এবং আবার পূর্বের স্তরে ফিরে যায় যেখানে সে জানা জিনিসও মনে রাখতে পারেনা এবং শিশুর মত হয়ে যায়। সুতরাং এমন একটি জগত অপরিহার্য, যেখানে মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

সুতরাং পার্থিব জীবনের ক্রমবিকাশের এই স্তরগুলো আখেরাতের দুটো প্রমান বহন করে। প্রথমত, যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সক্ষম, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টিতেও সক্ষম। দ্বিতীয়ত মানুষের ক্রমবিকাশের ধারাটাই এমন যে, তার সর্বশেষ পূর্ণতার স্তর ইহলোকে নয় বরং পরকালে অবস্থিত।

এভাবেই সৃষ্টি ও পুনঃ সৃষ্টির নিয়ম, ইহকাল ও পরকালের নিয়ম এবং হিসাব ও কার্যকালের নিয়ম একই সূত্রে গ্রোথিত। এসবই অসীম ক্ষমতাধর মহাকুশলী আল্লাহর হাতের মুঠোয় নিবদ্ধ। সুরা হজ্জের ৫ নং আয়াতে এ জীবন মৃত্যু তত্ত্বটি সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। জীবন ও মৃত্যুর এ তত্ত্ব সম্পর্কে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমুহ হতে আমরা অধিকতর তথ্য জানতে সক্ষম হবো ঃ

"যেদিন আমি আসমান সমূহকে গুটিয়ে নেবো, ঠিক যেভাবে কেতাবসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়। যেভাবে আমি একদিন এই সৃষ্টির সূচনা করে ছিলাম আমি আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো। এ হচ্ছে এমন এক ওয়াদা যার পালন করা আমার ওপর জরুরী, আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির এই কাজ আমি করবোই।" (আম্বিয়া ঃ ১০৪)

"মৃত্যুর পর, তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে বিচার-আচার সংক্রান্ত আল্লাহ তায়ালার সকল প্রতিশ্রুতিই সত্য পাবে। তিনিই এ সৃষ্টির অস্তিত্ব দান করেন। মৃত্যুর পর তিনিই আবার তাকে তার জীবন ফিরিয়ে দেবেন , যাতে করে তারা তাঁর ওপর ঈমান আনে এবং সাথে সাথে ভালো ভালো কাজ করে, যথার্থ ইনসাফের সাথে তাদের কাজের বিনিময় দান করতে পারেন এবং যারা তাঁকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানীয় ও কঠিন শাস্তি রয়েছে। এ কঠিন শাস্তির বিধান এজন্যেই রাখা হয়েছে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে পরকালের এই শাস্তিকে অস্বীকার করতো।" (ইউনুস ঃ ৪)

"আল্লাহ তায়ালাই সেই পরাক্রমশালী সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বেঁচে থাকার জন্যে তিনি তোমাদের রেজেক দান করেছেন। তিনি আবার এই জীবনের শেষে তোমাদের মৃত্যু দেবেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের আবার জীবন দেবেন।" (রোম ঃ ৪০)

"হে মানুষ তোমাদের গোটা মানব জাতিকে সৃষ্টি করা, আবার মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে পুনর্থান করা মূলত আল্লাহ তায়ালার নিকট একজন মানুষের সৃষ্টিও তার পুনরুত্থানের মতোই। নিঃ সন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শুনেন এবং দেখেন।" (লোকমান ঃ ২৮)

মৃত্যুর পর পূনঃজীবনের কোরআন প্রদত্ত এহেন মতবাদকে যারা অস্বীকার করে আলকোরআনেই তাদের যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কোরআনের কিছু বানী নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

"যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারা বলে, আমরাও আমাদের বাপ- দাদারা (মৃত্যুর পর পচে গলে) যখন মাটি হয়ে যাবো তখন কি আবার

www.pathagar.com

আমরা (কবর থেকে) উত্থিত হবো। এমন ধরণের ওয়াদা তো আমাদের আগে আমাদের বাপ-দাদাদের সাথেও করা হয়েছিলো। আসলে এগুলো সেকালের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (আন-নামল ঃ ৬৭-৬৮)

"হে নবী যদি কোনো কথার উপর তোমার আশ্চার্যন্বিত হতে হয় তাহলে আশ্চার্যন্বিত হবার মতো ঘটনা হচ্ছে তাদের সে কথা, (যখন তারা বলে) একবার মাটিতে পরিনত হবার পরও আমরা আবার নতুন করে জীবন লাভ করবো ? এরা হচ্ছে মূলত সেসব লোক যারা তাদের মালিককে অস্বীকার করে, এরাই হচ্ছে সে সব লোক যাদের গলদেশে (কেয়ামতের দিন) লৌহ শৃংখল থাকবে। আর (সর্বশেষে) এরাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী- সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।" (আর রাদ ঃ ৫)

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করে জমীনে তোমাদের বংশ বিস্তার করে চার দিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। মনে রেখো, তোমাদের সবাইকে আবার একদিন তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে। তিনিই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান, রাতদিনের আবর্তনও তার ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, এতোসবকিছু দেখেও তোমরা কি সত্য অনুধাবন করবে না ? (নবীদের সামনে) এরাও কিন্তু সে ধরণের অর্থহীন কথাই বললো যেমনি করে তাদের আগের লোকেরা বলেছে, আমরা যখন মরে যাবো, আমরা যখন মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাবো তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? (আসলে পুনরুত্থানের কথা বলে) এভাবেই আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, এই কথাগুলো অতীত দিনের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (আল মুমেনুন ঃ ৮০-৮৩)

"তারা বলে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটিতে মিশে যাবো তারপরও আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করা হবে? আসল কথা হচ্ছে এরা এসব বলে, তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টিকে অস্বীকার করতে চায়।" (আস-সাজদাহ ঃ ১০)

"যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তারা বলে (হে আমাদের সাথীরা) আমরা কি তোমাদের এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো যে তোমাদের কাছে (এসে এই আশ্চর্যজনক খবরটি) বলবে যে, তোমরা মৃত্যুর পর যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন পুনরায় তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে।" (সাবা ঃ ৭)

কোরআনের উপরের আয়াত সমূহে আখেরাতে অবিশ্বাসকারীদের মতামত প্রকাশ পেয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের অবস্থা হলো একেবারেই অন্ধের মত, যে কোন বিষয়ে সঠিক ধারণার পরিবর্তে আন্দাজ বা অনুমান ভিত্তিক মতামত প্রকাশ করে থাকে। আখেরাতে অবিশ্বাসী এসব সন্দেহবাদী এই বিশ্বাসের গোলমালের মধ্যে পড়ে আছে যে, আমাদের দেহ থেকে যখন প্রাণ আলাদা হয়ে যাবে, আমাদের দেহ পচে গলে যখন কবরের মাটির সাথে মিশে যাবে এবং একেবারে মাটিতে পরিনত হয়ে যাবে, তখন আসবে সে কেয়ামত?

www.pathagar.com

তখন আবার দেহ তৈরী হবে এবং আবার জীবন্ত হতে হবে? এ যে এক অদ্ভূত কথা। আরও যেসব কথা বলা হচ্ছে তাহলো, মৃত্যুর পরে কবরস্থ করে দেয়ার পর বহু বহু বছর অতীত হয়ে যাবে এবং তারপর হবে কেয়ামত। আমরা আমাদের বাপ-দাদারা, যারা কতকাল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদের সবাইকে আবার জিন্দা করে তোলা হবে। মরে পচে গলে সম্পূর্ণভাবে মাটিতে পরিনত হওয়ার পর আবার জীবিত করে তোলা হবে। একি অদ্ভূত কথা শোনানো হচ্ছে? আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও এসব কথা শোনানো হয়েছে। এসব কথা কি বিশ্বাস করতে হবে? এগুলো প্রাচীন কালের কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আজকের বস্তুবাদী নাস্তিকরাও প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করে থাকে আখেরাত ও কিয়ামত সম্পর্কে। আগেকার কাফেররা স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করতো, কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়া, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করতোনা, সন্দেহ পোষণ করতো। আজকের নাস্তিকরা বিশ্বাস করে মানুষ বস্তুর বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এককোষী প্রাণী হতে শিম্পাজী, গরিলা বা বানরের রূপ ধারণ করে এবং পরবর্তীতে আজকের মানুষের আকৃতিতে পৌঁছেছে। যেহেতু মানুষ বস্তুর বিবর্তিত রূপ, তাই মৃত্যুর পর তারা আবার মাটিতেই মিশে যাবে অর্থাৎ বস্তুতে পরিনত হবে। অতএব মানুষের পুনরায় জীবন্ত হওয়া এবং তাদের বিচার আচার ও শাস্তি-পুরস্কারেরও কোনো আয়োজন হবেনা। এ পৃথিবীটাই মানব জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি। আর এ বিশ্বাস হতেই জীবন সম্পর্কে তাদের দর্শন হলো, " Eat, drink and be merry" অর্থাৎ খাও-দাও ফূর্তি করো। কবির ভাষায় ঃ

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকির খাতায় শূন্য বসাও।'

আল কোরআনের ভাষায়, "আমি জমিন থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং পরিশেষে তা থেকে তোমাদেরকে বের করে আনবো (ত্বাহা)।"

মানুষের পুনরুত্থানের এ ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর। কোরআনের পাতায় পাতায় আখেরাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে কিয়ামতের সেই ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে তার দু' একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো ঃ

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিকের (আযাবের) ভয় করো, কেননা কেয়ামতের ভূমিকম্প হবে এক ভয়ংকর ঘটনা। সেদিন তোমরা দেখবে, বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন প্রতিটি নারী তার দুগ্ধ পোষ্য (কোলের শিশুকে) ভুলে যাবে, প্রতিটি গর্ভবতী নারী (গর্ভে অবস্থিত সন্তানের) বোঝা ফেলে দেবে, মানুষকে যখন দেখবে তখন তোমার মনে হবে তারা বুঝি কিছু নেশা গ্রস্থ মাতাল, যদিও তারা আসলে নেশাগ্রস্থ নয়, বরং (এ হচ্ছে মূলত এক

www.pathagar.com

ধরণের আযাব) আর আল্লাহ তায়ালার আযাব নিসন্দেহে অত্যন্ত ভয়াবহ।" (আল হজ্জ ঃ১-২)

"এক মহাবিপদ ! কি সে বিপদ? তুমি সেই বিপদের ব্যাপারে কিছু জানো কি? তবে শোন, সে হচ্ছে এমন এক বিপদ ও দূর্ঘটনার দিন যখন গোটা সৃষ্টি জগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মানুষগুলো আতংকগ্রস্থ হয়ে আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পতঙ্গের মতো এদিক সেদিক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে। পাহাড়গুলো মহা ধ্বংসে পড়ে রঙ বেরঙের ধুনা পশমের মতো উড়তে থাকবে।" (ক্বারিয়াহ ঃ ১-৫)

"যখন এই পৃথিবীকে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিয়ে চূড়ান্ত ভূকম্পনে কম্পিত করা হবে, তখন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং পৃথিবীর ভূখন্ড (তার ভেতর লুকিয়ে রাখা তার অধিবাসীদের যাবতীয় ক্রিয়াকান্ডের রেকর্ডপত্র) তাঁর সকল গচ্ছিত সম্পদ বাইরে বের করে দেবে। তখন নতুন জীবন পেয়ে মানুষ হতভম্ব হয়ে বলতে থাকবে পৃথিবীর হয়েছেটা কি ? তার অভ্যন্তরের সবকিছু বের হয়ে আসছে কেন? " (আল যিলযাল ঃ ১-৩)

"যখন (সবার চোখের সামনে) আসমান ফেটে পড়বে, তখন আসমানের তারাগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে একে একে ঝরে পড়বে , যখন স াগরের পানি রাশিকে (প্রচন্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে) উত্তাল করে তোলা হবে, যখন মানুষের পুরানো-নতুন কবর থেকে উপড়ে এগুলোর অধিবাসীদের নতুন করে জীবন দেয়া হবে, তখন প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে যে, সে দুনিয়ার জীবনে কি কি দায়িত্ব পালন করে এসেছে এবং কি কি দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ হয়েছে অর্থাৎ সে নিজেকে হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।" (ইনফিতার ঃ ১-৫)

এগুলো হলো কিয়ামতের ভয়ংকর দুর্ঘটনা ও মানুষের পূনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে আলকোরআনে বর্ণিত কতিপয় খন্ডচিত্র। পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরাও একমত। হয়তো তাদের জানা নেই সেই ধ্বংস কতটা ভয়ংকর হতে পারে। তাদের মত বিজ্ঞানীদের তৈরী পরমানু বোমার ধ্বংস ক্ষমতা কিংবা একটি সুনামী বা সিডরের ধ্বংস লীলা নিয়ে চিন্তা করলেই সেদিনের ভয়াবহতা অনুভব করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আর মানুষের চারপাশে বিদ্যমান প্রকৃতিতে বসন্তকালে জীবনের স্পন্দন ও শীতকালে সেগুলোর শুকিয়ে নির্জীব হওয়ার দিক লক্ষ্য করলেই আমরা মানুষের দ্বিতীয়বার জীবন লাভের বিষয়ে সংশয়মুক্ত হতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকবে না।

আমরা জানতে পারলাম কিয়ামতের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পথ ধরে গোটা মানব জাতি সমবেত হবে হাশরের ময়দানে। এখানে আল্লাহ তায়ালা মানুষের পৃথিবীর জীবনের কর্মকান্ডের বিচার-ফয়সালা করবেন। মানুষ তাদের ভালো-মন্দ আমলের বিনিময়ে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম লাভ

www.pathagar.com

করবে। কোরআন আদালতে আখেরাতের যে চিত্র অংকন করেছে এখানে তার কিছু খন্ড চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে।

"(হে নবী) এদের সেদিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যেদিন আল্লাহ তায়ালার দুশমনদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জড়ো করা হবে। সেদিন প্রত্যেকের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন দলে উপদলে বিন্যস্ত করা হবে। এমনি করে যেতে যেতে তারা যখন তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা বিচারের পাল্লার কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের যাবতীয় অন্যায় কাজের উপর সাক্ষ্য দেবে। নিজের বিরুদ্ধে এদের সাক্ষ্য দিতে দেখে তারা তাদের চামড়াগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলবে, তোমরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন ? উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যিনি সবকিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি আজ আমাদেরও কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই যেহেতু তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তাই তোমাদের তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তায়াল বলবেন, তোমরা দুনিয়ার জীবনে গুনাহ করার সময় কোনো কিছুই এদের কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টা করতে না - এই ভেবে যে, তোমাদের কান, তোমাদের চোখ ও তোমাদের চামড়া কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, বরং তোমরা তো মনে করতে যে তোমরা যা কিছু করছিলে তার অনেক কিছু সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও বুঝি জানেন না। তোমাদের এই যে ধারণা, যা তোমরা তোমাদের মালিক সম্পর্কে পোষণ করতে, মূলত তা-ই আজ তোমাদের এই ভরাডুবি ঘটিয়েছে। ফলে তোমরা আজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছো।" (হা-মীম আল্ সাজদাহ ঃ ১৯-২৩)

"সেদিন যখন মানুষ সবাই আল্লাহর সামনে বেরিয়ে পড়বে তখন তাদের কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে গোপন থাকবে না। সে সময় ঘোষণাকারীর কণ্ঠ ভেসে আসবে বলো তো, আজ সর্বময় রাজত্ব কার ? সমগ্র সৃষ্টি এককণ্ঠে বলে উঠবে, প্রবল পরাক্রমাশালী এক আল্লাহ তায়ালার। আজ প্রত্যেকটি মানুষকে সেই পরিমান প্রতিফলই দেয়া হবে, যে পরিমান সে দুনিয়ায় অর্জন করে এসেছে। হিসাবের ব্যাপারে আজ কারও প্রতি কোন রকম অবিচার করা হবেনা। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসেব গ্রহণে তৎপর।" (আল মুমেন ঃ ১৬-১৭)

"সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে আর এই প্রলয়ংকারী ফুঁকের সাথে সাথে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতো আদম সন্তান আমি বানিয়েছি তোমরা সবাই দলবদ্ধভাবে, সারিবদ্ধভাবে আমার সামনে এসে জড়ো হবে। আসমান সমূহ তখন ফেটে ফেটে পড়তে শুরু করবে। মনে হবে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে আকাশমালা বুঝি তার সবকটি দরজাই খুলে দিয়েছে। জমিনের সাথে যে পাহাড়গুলোকে পেরেকের ন্যায় গেড়ে রাখা হয়েছিলো মনে হবে, সেই পর্বতমালা নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে শুরু করেছে, ঠিক মরিচিকার ন্যায়।

www.pathagar.com

(দেখে মনেই হবেনা যে, এখানে কোনো কালে বিশালাকার পাহাড় পর্বত দাঁড়িয়ে ছিলো। এই হিসাব নিকাশের পর মানুষরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।) বস্তুত জাহান্নাম হবে খোদাদ্রোহী ও পাপীদের জন্যে এক গোপন মরণ ফাঁদ ও নিকৃষ্টতম আবাসস্থল। যেখানে তারা যুগের পর যুগ ধরে পড়ে থাকবে। এই বাসস্থানে কোনো ধরণের ঠান্ডা ও পানীয় জাতের কিছুর স্বাদ তারা ভোগ করবে না। থাকবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া ভিন্ন কিছু আয়োজন। পৃথিবীর বুকে করে আসা যাবতীয় অন্যায় ও বিদ্রোহের এই হচ্ছে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিফল।" (আন-নাবা ঃ ১৮-২৬)

"যখন সাগরে ও তার পানিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে, যখন কবর থেকে পুনরায় উঠানো প্রাণসমূহকে নিজ নিজ দেহের সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে, তখন নির্মমভাবে পুতে রাখা (নিষ্পাপ ও কচি) মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। যখন মানুষের সারা জীবনের কাজ কর্মের হিসাব নিকাশ তার সামনে খুলে খুলে পেশ করা হবে। যখন আসমানের পর্দা সরিয়ে তার অভ্যন্তরীণ রহস্যগুলোকে দেখানো হবে, যখন জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডলী প্রজ্জলিত হবে, তখন জান্নাতকে তার সমস্ত নেয়ামতসহ মানুষের কাছে নিয়ে আসা হবে- সেই কঠোর হাশরের দিনে প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে তার জীবনের কামাই কতটুকু এবং সে কি সম্পদ নিয়ে আজ মালিকের দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে।" (আত্ তাকভীর ঃ ৬-১৪)

উপরের উদ্বৃতি সমূহে কিয়ামত ও হাশরের বিচার ফয়সালার ভয়ংকর দৃশ্যাবলী ও অপরাধীদের করুন দশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিচে কেয়ামত, হাশর এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আরও কতিপয় দৃশ্য তুলে ধরা হলো যেগুলো অবলোকন করলে পাঠকের হৃদয়- মনে আখেরাতের বাস্তবতা অধিকতর দৃঢ়মূল হতে বাধ্য। এ ধরণের একটি খন্ড চিত্র হলো কোরআনের সুরা আল গাশিয়া ঃ

"তুমি কি অপ্রতিরোধ্য ও আচ্ছন্নকারী সেই মহাবিপদের দিনের কথা শুনেছো, যেদিন পাপ-পূন্যের হিসাব নিকাশের পর কিছু লোকের চেহারা ভীতিকাতর, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। (সেদিন এরাই হবে জাহান্নামী।) জ্বলন্ত অঙ্গারে জ্বলে পুড়ে এদের চেহারা সেদিন ঝলসে যাবে।

এদেরকে ফুটন্ত পানির কুয়া থেকে পানীয় সরবরাহ করা হবে। খাবার হিসেবে কাঁটা বিশিষ্ট শুকনো খড় ছাড়া আর কিছুই তাদের দেয়া হবেনা। এই খাবার যেমন তাদের পুষ্ট করবে না তেমনি এ দ্বারা তাদের ক্ষুধাও মিটবেনা।

এদের পাশাপাশি অন্য কিছু চেহারা থাকবে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল। তারা তাদের দুনিয়ার জীবনে করে আসা সকল চেষ্টা সাধনার সফলতা দেখে ভীষণ খুশী হবে। এদের স্থান হবে আলীশান জান্নাতে। সেখানে এরা কোনো বাজে প্রলাপও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা শুনবেনা। এসব জান্নাতের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে বিভিন্ন ধরণের ঝরণা ধারা।

www.pathagar.com

এতে উন্নত ধরণের সুসজ্জিত আসন থাকবে যার আশে-পাশে সংরক্ষিত থাকবে নানা ধরণের পানপাত্র। আরাম আয়েশের জন্যে সাজানো থাকবে সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ। আরো থাকবে সযত্নে পেতে রাখা উৎকৃষ্ট জাতের কার্পেটের বিছানা।" (আল গাশিয়া ঃ ১-১৬)

গোটা কোরআনে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য পাশা পাশি বর্ণিত হয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরে সেসব দৃশ্যের বর্ণনা অসম্ভব। সূরা আর রহমান ও আল ওয়াক্বেয়াহ-এর বৃহৎ অংশ জুড়ে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং এগুলোর বাসিন্দাদের জন্য নির্ধারিত সীমাহীন নেয়ামত ও অনন্ত শাস্তির বিস্তৃত বর্ণনা দৃশ্যায়ন করা হয়েছে। সূরা আল ওয়াক্বেয়ায় কেয়ামত দিয়ে শুরু হয়ে জাহান্নামের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে এ দৃশ্যের ইতি টানা হয়েছে। সুরাটি যেভাবে শুরু হয়েছে তাহলো, "যখন কেয়ামতের ঘটনাটি সংঘটিত হবে, তখন এ ঘটনার সত্যতাকে কেউই মিথ্যা বলতে পারবেনা। সে মহা ঘটনা কাউকে সমুন্নত ও কাউকে ভুলণ্ঠিত করে দেবে। পৃথিবী যখন প্রবল কম্পনে কেঁপে উঠবে এবং সে প্রবল কম্পনে তখন পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলা বালিতে পরিনত হয়ে যাবে। তখন তোমরা সবাই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রথমত হবে ডান দিকের দল, এই ডান দিকের দলটি কতো সৌভাগ্যবান। দ্বিতীয় হবে বাম দিকের দল, আর এই বাম দিকের দলটি কতো হতভাগ্য। তৃতীয়ত হবে অগ্রবর্তি দল, এরাই হচ্ছে দ্বীনের পথে প্রবেশকারী প্রথম অগ্রগামী দল। এরাই হবে আল্লাহ তায়ালার একান্ত ঘনিষ্ট বান্দা। এরা অবস্থান করবে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত সমূহে।" এভাবে দুধরণের জান্নাতের দীর্ঘ বর্ণনার পর জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্যায়ন শেষ হয়েছে। জাহান্নামের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "অতঃপর সবাইকে সমবেত করার পর কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, ওহে পথভ্রষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হতভাগ্য ব্যক্তিরা। দুনিয়ার জীবনে রোজগারের বিনিময়ে আজ তোমরা ভক্ষণ করবে যাক্কুম গাছের অংশ। অতপর তা দিয়েই আজ তোমরা ক্ষুধার পেট ভরবে। তার ওপর তোমরা আজ পান করবে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি। তাও আবার পান করতে থাকবে মরুভূমির তৃষ্ণার্ত উটের মতো প্রচুর পরিমান। এই হবে তাদের যথার্থ মেহেমানদারী সেদিন যারা হবে বাম পাশের লোক।" সুরা আল বালাদেও জান্নাতীদের ডানপন্থী এবং জাহান্নামীদের বামপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা হতে আমরা জানতে পারলাম যে, মানব জীবনের চূড়ান্ত পরিনতি হলো জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। মৃত্যুর মধ্যেই মানব জীবনের শেষ নয়। বরং মৃত্যুর পর অপেক্ষা করছে অনন্ত আখেরাত।

www.pathagar.com

মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই জীবনে সাফল্য লাভের লড়াইয়ে লিপ্ত। কোন মানুষই ব্যর্থ হতে চায়না এবং ব্যর্থতার কোনো প্রকার দায়ভারও বহন করতে চায়না। তাই মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা বিষয়ক আলোচনার শুরুতে প্রত্যেক পাঠকের উচিৎ আলকোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়া। আলোকোরআনের বাণী ঃ

"স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন আগে পরের সকল মানুষ ও জ্বিনকে একত্র করা হবে, সেদিন হবে তোমাদের মহা সমাবেশের দিন। তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে (হে মানুষ ও জ্বিন) আজকের দিনটিই হচ্ছে আসল লাভ লোকসানের দিন- জয়পরাজয়ের দিন। আজ সাফল্যের দিন হচ্ছে তার যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে। তিনি তার সকল গুনাহ মোচন করে দেবেন, তাকে তিনি এক সুরম্য জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে সুপেয় ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আর এটাই হবে চরমতম সাফল্য। আর লোকসানের দিন হচ্ছে তার জন্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এসব লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে এরা সবাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কতো নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল !" (আত্ তাগাবুন ঃ ৯-১০)

মহাগ্রন্থ কোরআনের উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পরবর্তী বিচার দিনকে মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতার দিন হিসাবে অভিহিত করেছেন। কেননা এইদিন আল্লাহতায়ালা পৃথিবীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত জন্ম নেয়া সকল মানুষের পার্থিব জগতের যাবতীয় কর্মের হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাদের ভালো কাজের বিনিময় হিসেবে চিরস্থায়ী জান্নাত, আর যারা কাফের ও অপরাধী তাদের পাপ কাজের শাস্তি স্বরূপ চির অশান্তির আবাস প্রজ্জ্বলিত জাহান্নাম প্রদান করবেন। এইদিন আল্লাহর ফয়সালায় যেসব মানুষ জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে তারাই সাফল্য লাভ করবে, আর আল্লাহর চূড়ান্ত বিচারে জান্নাতবাসী হওয়ার সুযোগই প্রকৃত সাফল্য। আল্লাহর আদালতে যাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার রায় দেয়া হবে তারাই সত্যিকারের ব্যর্থ। তাদের চেয়ে হতভাগা আর কেউ হতে পারেনা।

কিন্তু আমরা মানুষ। আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার দর্শন কোরআন উপস্থাপিত দর্শনের চেয়ে ভিন্ন। আমরা আখেরাত নয়, এ দুনিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচনা করছি। আর জাগতিক সাফল্যের মূলকথা হলো, ক্ষমতা ও সম্পদ। পৃথিবীতে যে

www.pathagar.com

যতবেশী ক্ষমতাবান কিংবা বিত্তের মালিক আমরা তাকে ততবেশী সফল মনে করছি এবং তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে আমাদের সকল প্রয়াস ও প্রচেষ্টা। এটি ব্যক্তির পাশাপাশি দেশ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের এ সংগ্রাম সাধনা আমৃত্যু চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কোরআন পাকে আল্লাহর ঘোষণা ঃ "সম্পদের প্রাচুর্য ও স্বার্থের প্রতিযোগিতা তোমাদের জীবনের আসল লক্ষ্য থেকে গাফেল করে রেখেছে। আর এ অহংকার ও উদাসীনতা শেষ হবার আগেই একদিন তোমাদের সামনে তোমাদের মৃত্যুর ক্ষণটিও এসে হাজির হবে।" (আত্তাকাসুর ঃ ১-২)

আলকোরআন আখেরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসাবে আখ্যায়িত করার অর্থ এ নয় যে, মানুষের জাগতিক সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্যকে গৌণ করে দেখা হয়েছে। আমাদের পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, আর তাই এজগতের সাফল্য এবং সুখ ও ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আখেরাত যেহেতু সুদীর্ঘ অনন্তকাল ব্যাপী। আর আখেরাতের সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আর এ কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতার মাঝেও তারতম্য বিদ্যমান। তাছাড়া দুনিয়া হলো কর্মের স্থান, আর আখেরাত হলো পার্থিব জগতে মানুষের কৃতকর্মের ফল ভোগের জায়গা। মানুষের পার্থিব জীবন ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে সুখ বা দুঃখ কোনটাই স্থায়ী হয়না। আলোর পর আধার, দিনের পর রাতের আগমন ঘটে, অনুরূপভাবে সুখের পর দুঃখ আবার দুঃখের পর সুখ আসে। এভাবে ধনী ব্যক্তি সময়ের ব্যবধানে গরীব এবং গরীব ধনী হয়। ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থিত ব্যক্তি ক্ষমতা হারিয়ে সাধারণের কাতারে নেমে যায়। এভাবে পৃথিবীর দিনগুলোতে মানব জীবনে সাফল্য ব্যর্থতা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। মানুষের পার্থিব জগতে সাফল্য ব্যর্থতার চক্রাকারে এ ঘূর্ণন আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা। এ প্রসঙ্গে কোরআনের বাণী ঃ

" বল হে আল্লাহ, হে বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধিপতি, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করে থাকো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় মংগল ও কল্যাণ কেবল তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তুমি রাতকে দিনের এবং দিনকে রাতের অভ্যন্তরে ঢুকাও, আর জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আন। আর তুমি যাকে চাও বিনা হিসাবে জীবিকা দাও।" (আল-ইমরান ঃ ২৬-২৭)

অতএব আলকোরআনের ভাষ্যমতে মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর ন্যায় মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা একই সূত্রে গাঁথা। আল্লাহর বিধানের আওতায় মানুষের কর্মের উপর ভিত্তি করে যেমনি তাদের পার্থিব জীবনে উত্থান-পতন ঘটে তেমনি আখেরাতে মানব জীবনে সাফল্য এবং ব্যর্থতাও মানুষের ইহজাগতিক কর্মের উপর, নির্ভরশীল। কোরআনের মতে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত সাফল্য ঈমান ও তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়া হলো আমলে সালেহ বা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও

www.pathagar.com

আনুগত্য। যারা কাফের ও শয়তানের অনুসারী, তাদের জীবন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাই ব্যর্থ। আপাত দৃষ্টিতে তাদের পার্থিব জীবন যতই চাকচিক্যময় ও জৌলুসপূর্ণ দেখাক না কেন। কেননা ক্ষমতাবান ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমতা হারানোর আশংকায় শংকিত থাকে। সম্পদশালী ব্যক্তি অধিক সম্পদের প্রতিযোগিতায় অর্জিত সম্পদ ভোগ করতে পারেনা। সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি শত্রু কতৃক আক্রান্ত হওয়া কিংবা জীবন হানির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্থ থাকে। নানাবিধ রোগ যন্ত্রণা, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যায় মানুষের দেহ ও মনের সুখ- শান্তি হারাম হয়ে যায়।

এখন দেখা যাক কোরআনের আলোকে আমরা কিভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত সাফল্য লাভে সক্ষম হতে পারি। আলকোরআন হতে কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্বৃত করার মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে চেষ্টা করবো।

"এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, যা মুত্তাকীদের জন্যে পথ প্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ কায়েম করে, আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, তোমার উপর ও তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবগুলোর প্রতি ঈমান আনে এবং আখেরাতের প্রতি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে, এরাই আল্লাহ তায়ালার দেয়া সঠিক পথের উপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম।" (আল বাকারা ঃ ২-৫)

"হে ঈমানদাররা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মৃত্যুবরণ করোনা সঠিকভাবে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত। আর আল্লাহর রশিকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরো তোমরা সম্মিলিতভাবে এবং একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়োনা। স্মরণ করো, তোমাদের প্রতি আল্লাহর ঐ মহান নেয়ামতকে যার কারণে পরস্পর শত্রু থাকা অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরগুলিকে জুড়ে দিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমাদের অবস্থা তো এমন মারাত্মক হয়ে গিয়েছিল যেন তোমরা আগুনের গর্তের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলে। সেখান থেকে তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করলেন। এইভাবে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তোমাদের কাছে তাঁর নির্দেশ সমূহের কথা যাতে করে তোমরা হিদায়াত পেতে পারো। তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একদল থাকতে হবে যারা মানুষকে সুপরিচিত ভাল কাজ সমূহের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজগুলি থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম।" (আল ইমরান ঃ ১০২-১০৪)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী সৎ কাজ করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর কতৃত্ব দান করবেন- যেভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে তিনি দান করেছিলেন।" (সুরা নূর ঃ ৫৫)

"আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের ধন-প্রাণ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর তারা যেমন মারে তেমনি মরেও।

www.pathagar.com

তাদের সাথে আল্লাহর জান্নাত দানের ওয়াদা আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকা-পোকত ওয়াদা। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে উদ্বৃত। আল্লাহর তুলনায় অধিক নিজ ওয়াদা পূরণকারী আর কে হতে পারে ? অতএব তোমরা সন্তুষ্টি অর্জন কর উৎফুল্ল হও তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয় জন্যে, যা তোমরা আল্লাহর সাথে সুসম্পন্ন করেছ। বস্তুতঃ এই হচ্ছে বিরাট ও মহান সাফল্য।" (তাওবা ঃ ১১১)

" অথচ যদি সেই জনপদের মানুষগুলো আল্লাহর উপর ঈমান আনতো এবং আল্লাহকে ভয় করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-জমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তা না করে তারা আমার নবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। সুতরাং তাদের যাবতীয় অন্যায় কর্মকান্ডের জন্যে আমি তাদের ভীষণভাবে শাস্তি দিলাম।" (আল আ'রাফ ঃ ৯৬)

এ আয়াতে এবং সুরা নুরের ৫৫ নং আয়াতে দুনিয়ার সাফল্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুরা আস সাফ-এর ১০-১৩ পর্যন্ত আয়াত সমূহে দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য ও বিজয় এবং মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সুরা হজ্জের ৭৭-৭৮ এবং সুরা মমেনুন এর ১-১১ আয়াতেও সাফল্যের শর্ত বর্ণিত হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি যে, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফলোর শর্ত হলো- ঈমান এবং তাকওয়া। সুরা আল বাকারার ১৭৭ নং আয়াত এবং সুরা আল ইমরানের ১৩৩-১৩৬ পর্যন্ত আয়াত সমূহে তাকওয়া মূলক জীবনের এক অতি মনোরম চিত্র অংকন করা হয়েছে। আলকোর আনের অসংখ্য জায়গায় ঈমানদার ও মুত্তাকীদের জীবনচিত্র তুলে ধরে তাদের সাফল্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

মানব জীবনে সাফল্যের কোরআনী বর্ণনার পর ব্যর্থতারও কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো ঃ

"(হে নবী) তুমি বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে একান্ত নিষ্ঠার সাথে আমি যেন আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করি। আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আল্লাহ তায়ালার সামনে আত্মসমর্পণ কারীদের মধ্যে অগ্রণী হই। তুমি আরো বলো, আমি যদি আমার মালিকের নাফরমানি করি তাহলে আমি আমার ওপর মহান দিনের শাস্তির ভয় করি। তুমি বলো, আমি একান্ত নিষ্ঠাবান হয়েই আল্লাহর ইবাদাত করি। আর তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই হাতে। তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যারই চাও গোলামী করো। হে নবী বলো, ভারী ক্ষতিগ্রস্থ হবে তারা, যারা দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্যের গোলামী করার কারণে কেয়ামতের দিন নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের ভীষণ ক্ষতি করবে। তোমরা জেনে রেখো এই আখেরাতের ক্ষতিই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্যে তাদের ওপর থেকে আগুনের ছায়াদানকারী মেঘমালা থাকবে। তাদের নীচের দিকেও থাকবে আগুনেরই বিছানা। এই হচ্ছে সেই বীভৎস পরিনাম, যা দিয়ে আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালা তার বান্দাদের ভয় দেখাচ্ছেন। অতএব হে আমার বান্দারা তোমরা তাকে ভয় করো যাতে করে এই জঘন্য আজাব থেকে তোমরা বাঁচতে পারো।" (আল ঝুমার ঃ ১১-১৬) এরপর ১৭-২০ আয়াত পর্যন্ত মুত্তাকীদের সাফল্য হিসাবে জান্নাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যে ব্যক্তি ঈমানের একান্ত প্রান্তে থেকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে, যদি এতে তার কোনো পার্থিব উপকার হয় তাহলে সে ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় ; কিন্তু যদি কোনো দুঃখ কষ্ট তাকে পেয়ে বসে তাহলে তার মুখ পুনরায় কুফরীর দিকেই ফিরে যায়, এভাবে সে দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও হারায়। আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (আল হজ্জ ঃ ১১)।

সুরা আল মুনাফেকুনের ৯-১১ নম্বর আয়াতেও ব্যর্থতার চিত্র অংকিত হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আলকোরআনের সাফল্য ও ব্যর্থতা সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াত সমূহে সাফল্যের ক্ষেত্রে যে পরিভাষা প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে তাহলো 'ফালাহ' অর্থাৎ কল্যাণ, আর ব্যর্থতার জন্যে 'খুসরুণ' অর্থাৎ ক্ষতি। যাবতীয় ক্ষতি হতে মুক্তির পথ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে তাকওয়া কে। আর তাকওয়ার পরিনাম পরিনতি হলো চিরস্থায়ী জান্নাত। একথাটি কোরআনের সুরা আর রাদ-এ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহলো ঃ

"মুত্তাকী লোকদের সাথে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ হচ্ছে (যেমন একটি বাগান এবং) তার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলফলাদি হচ্ছে চিরস্থায়ী। একইভাবে সেই বাগানের গাছ সমূহের ছায়া, তাও হবে চিরস্থায়ী। এসবই হচ্ছে তাদের পরিনাম, যারা দুনিয়ার জীবনে তাকওয়ার জীবন অতিবাহিত করেছে। কাফেরদের পরিনাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।" (আর রা'দ ঃ ৩৫)।

কোরআনের ঘোষণা মত জান্নাতী ব্যক্তিরাই প্রকৃত সফলকাম। এ প্রসংগে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"জাহান্নামের অধিবাসীরা ও জান্নাতের অধিবাসীরা কখনো এক হতে পারে না। জান্নাতবাসীরা অবশ্যই সফলকাম।" (আল হাশর ঃ ২০)

অতএব আল্লাহর ঘোষণা ঃ

"(হে ইমানদার বান্দারা) তোমরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সেই প্রতিশ্রুত ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্যে যার আয়তন আসমান জমীনের সমান প্রশস্ত। তাকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সে সব মানুষের জন্যে যারা আল্লাহ ও তার প্রেরিত রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে।" (আল হাদীদ ঃ ২১)

www.pathagar.com

সাফল্য ও ব্যর্থতা পরস্পর হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলছে। জান্নাতের বিপরীতে যেমন জাহান্নামের অবস্থান, তেমনি সাফল্যের বিপরীতে ব্যর্থতার ভয়াবহতা। আর এ কারণে আলকোরআনে আল্লাহর পক্ষ হতে অতিক্ষুদ্র পরিসরে সাফল্য ও ব্যর্থতার যে ছবি আঁকা হয়েছে এবং ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই যা প্রাতঃ স্মরণীয় হওয়া উচিত, সেই সূরা 'আল আসর' দিয়েই আমরা জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা শীর্ষক আলোচনার উপসংহার টানছি।

"মহাকালের শপথ, মানুষ মাত্রই ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, সত্যের স্বপক্ষে মানুষকে উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য করুণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রকার অকল্যাণ ও ক্ষতি হতে রক্ষা করুণ। হে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করো।

তথ্য সূত্র :

১. মহাগ্রন্থ আলকোরআন
২. তাফসীর ফী যিললিল কোরআন
৩. তাফহীমুল কোরআন
৪. তাফসীর মাআরেফুল কোরআন।

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ : মোঃ পলাশ উদ্দিন